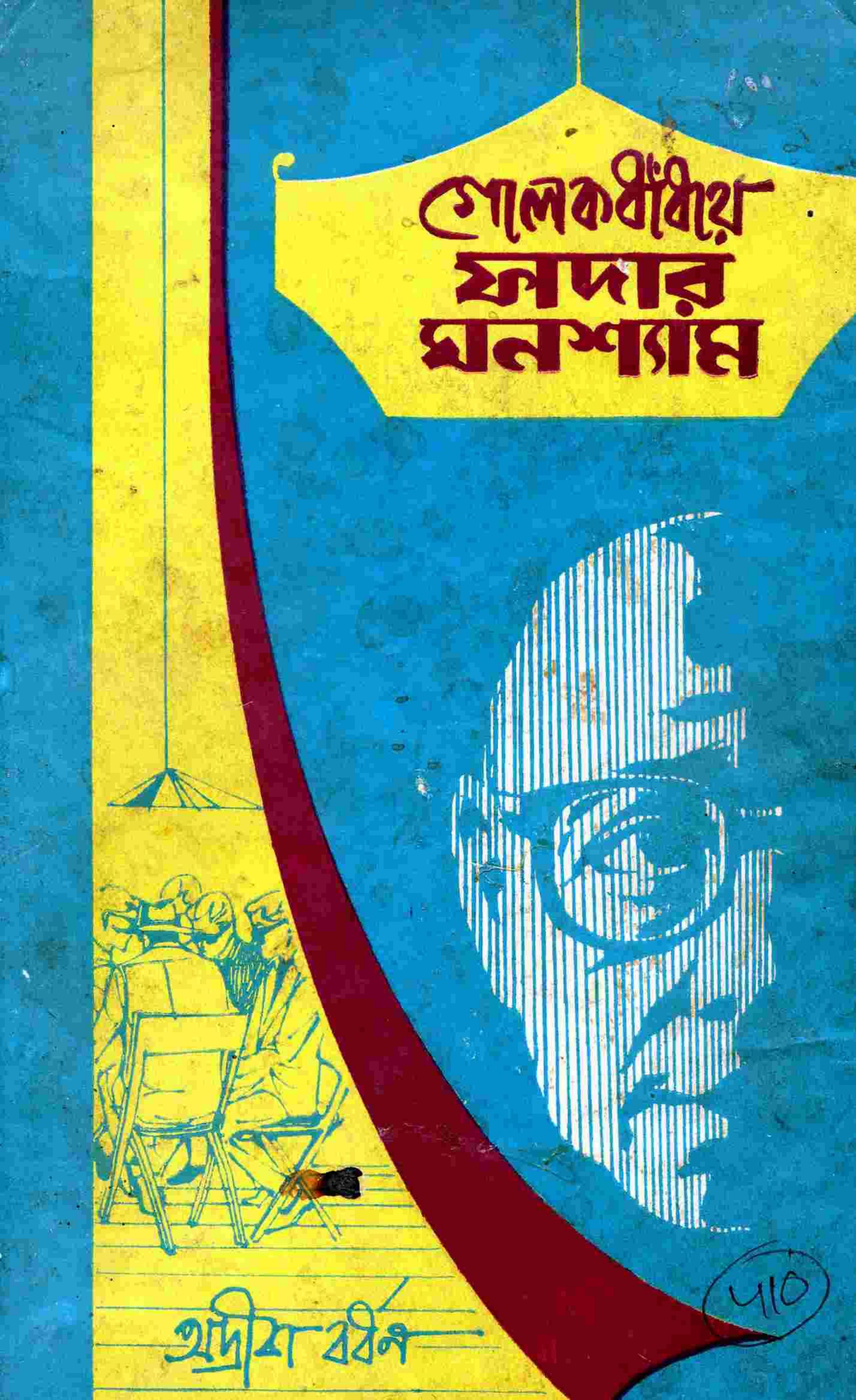

গোলকধাঁধায় ফাদার ঘনশ্যাম

৭।০

অদ্রীশ বর্ধন

~~COLLEGE LIBRARY~~
~~(Evening Dept.)~~
~~No. 3596~~
~~Date 29. 7. 70~~
~~Siliguri, Darjeeling.~~

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৭৪

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

M.B.S. PATHAGAR
Accn No. 3338
Call No.

মুদ্রাকর :
বিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
আশিস সেনগুপ্ত

চার টাকা

উৎসর্গ

জীবনের গোলকধাঁধায়
যে এসেছিল
পথের নিশানা নিয়ে—

MANIK BANDYOPADHYAYA SMRITI PATHAGAR
P.O. GHOGOMALI
DIST. JALPAIGURI
ESTD. - 1978

'সাপ্তাহিক অমৃত'তে ধারাবাহিকভাবে ফাদার ঘনশ্যামের কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার সময়ে পাঠকসাধারণ জেনেছিলেন গল্পগুলি বিদেশী ছায়াশ্রিত। কিন্তু তাতে কৌতূহল নিবৃত্ত হয়নি। তাই জানাচ্ছি, রহস্য-সন্ধানী ফাদার ঘনশ্যামের অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপ রচিত হয়েছে জি. কে. চেস্টারটনের ধ্রুপদী ডিটেকটিভ গল্পসম্ভারের নায়ক ফাদার ব্রাউন-এরই ছায়া অবলম্বনে। বাংলাসাহিত্যে উৎকৃষ্ট গোয়েন্দাগল্পের অভাব বলেই ফাদার ব্রাউনকে এনেছিলাম ফাদার ঘনশ্যামের গাউন পরিয়ে। সুখের বিষয়, ঘনশ্যাম পাদরী তার নির্বোধ চেহারা নিয়েও রুচিবান পাঠকমহলে আপন-স্থান করে নিয়েছে, ঘনশ্যাম-কাহিনী সমাদৃত হয়েছে এবং আর একবার প্রমাণিত হয়েছে, যা উৎকৃষ্ট তা কখনো বাংলাসাহিত্যে অপাংক্তেয় থাকে না।

—লেখক

BANDYOPADHYAYA SMRITI PATHAGAR MANIK
P.C. GHOGOMALI
DIST. JALPAIGURI
ESTD. - 1978

3338

বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ধূমকেতুর মত বৈঠকখানায় এসে হাজির ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

চমকে উঠলাম আমি, হুররে করে উঠল ইন্দ্রনাথ, রান্নাঘর থেকে অনুবৌদিকে ডেকে আনতে ছুটল কবিতা, আর রেডিও ফ্রেমের মোটা চশমা খুলে সকৌতুকে চোখ তুললেন ডক্টর চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী মানে, আমাদের চিত্তদা।

জিজ্ঞেস করলেন স্মিতমুখে—"ব্যাপার কি ফাদার, চেহারাটা এমন ছন্নছাড়া কেন?"

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঘনশ্যাম পাদরী। কর্দমাক্ত ভাঙা ছাতাটা পরম যত্নে একটা চেয়ারের ওপর রেখে বসল আরেকটা চেয়ারে। তারপর বলল চিঁ-চিঁ স্বরে—"জল।"

"জল!" ভুরু কুঁচকোল ইন্দ্রনাথ—"কিন্তু এমন কাতর কণ্ঠে কেন?"

"অনেক দূর থেকে আসছি যে।"

"কতদূর?"

"গাঁয়ের নাম বজ্রপুর।"

"সুমেরু পাহাড়ে?" ফসকরে প্রশ্ন করলেন চিত্তদা।

"চেনেন দেখছি।"

"চিনবে না মানে? ম্যাঙ্গালোরের প্রতিটি ইঞ্চির ভূগোল আমার মুখস্ত। স্যালদান্হা প্যালেস দেখলেন?"

"তা দেখেছি," বলে হঠাৎ মুখ অন্ধকার করে বসে রইল ফাদার। ইতিমধ্যে হলুদরঞ্জিত পদ্মহস্ত শাড়ির খুঁটে মুছতে মুছতে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন অনুবৌদি। পেছনে উল্লসিত মুখে কবিতা।

দেখে বিমর্ষ হলাম। প্রাগ্‌বিবাহ কালে আমাকে দর্শন করে এভাবে উল্লসিত হতে দেখেছি তাকে। আর এই দেখলাম। ডিটেকটিভ গল্পের ভেলকি তো—শোনার আগ্রহেই এত উল্লাস! তোবা! তোবা!

আচমকা প্রশ্ন করল ঘনশ্যাম—"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, হাতুড়ি ক'রকম হয়?"

হঠাৎ প্রশ্নে ভড়কে গেলেন চিত্তদা—"তার মানে?"

"মানে, হাতুড়ি কয় প্রকার হয়?"

"স্যাকরার হাতুড়ি, কামারের হাতুড়ি, তবলচির হাতুড়ি—"

"ভগবানের হাতুড়ির নাম শুনেছেন?"

"সেটা আবার কি?" এবার বিস্ময় প্রকাশের পালা গোয়েন্দা-কাহিনী-পাগল কবিতার।

"সে এক আশ্চর্য কাহিনী।"

"এখুনি হোক।"

বাতাস শুঁকে বলল পাদরী—"মাছের কচুরীর গন্ধ পাচ্ছি না?"

"আগে গল্প। তারপর কচুরী।"

"বেশ, আগে গল্প, তারপর কচুরী। কিন্তু আমার গল্পে বেশী আমি থাকলে বড্ড অহমিকা প্রকাশ পাবে। সুতরাং লুপ্ত হোক আমিত্ব—অন্তর্ধান করুক উত্তম পুরুষ। আসুক এক গেলাস জল।"

পাহাড়টার নাম সুমেরু। পাহাড়ের ওপর দুর্গ-প্রাকার ঘেরা ছোট্ট গ্রামটার নাম বজ্রপুর।

ম্যাঙ্গালোর থেকে মোটরযোগে সাউথ কানাড়া যাওয়ার সময়ে পথের পাশে পড়ে সুমেরু পর্বত। দূর থেকে দেখা যায়, পাহাড়ের মাথাটা যেন বল্লমের মত ছুঁচোলো হয়ে আকাশ ফুঁড়তে চাইছে।

ছুঁচোলো ফলাটা কিন্তু পাহাড়ের চূড়ো নয়। বজ্রপুর গ্রামের শতকরা নব্বইজনই রোমান ক্যাথোলিক খৃষ্টান। গ্রামের ঠিক

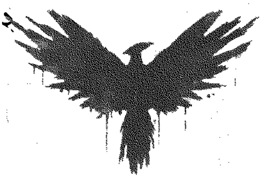

মাঝখানে তৈরী ওলন্দাজ গির্জের চূড়োটাকেই দূর থেকে মনে হয় সুমেরু পর্বতের বল্লম-শীর্ষ।

গির্জের গোড়ায় রয়েছে একটা কামারশালা। সর্বক্ষণই ছোটবড় হাতুড়ি আর বিস্তর লোহালক্কড় ছড়ানো এখানে সেখানে। আগুনের গনগনে আভায় প্রায় হামেশাই লাল হয়ে থাকে ভেতরটা।

কামারশালার ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে একটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন রেস্তোরাঁ। নাম, 'বাদশাহী হোটেল'।

নামেই বাদশাহী—আমীরি চালের চিহ্ন-মাত্র নেই এ রেস্তোরাঁয়। নেই বিলোল বেশা তাতারিণীর হাতে মিঠে সেতারের ঝঙ্কার, নেই লোবান-গুগ্‌গুলের সুগন্ধ, নেই সিরাজীর নীলাভ পেয়ালা।

এ হোটেলের সামনে পাতা রঙচটা কয়েকটা বেঞ্চি।

কামারশালা আর হোটেলের মাঝখান দিয়ে গিয়ে পাথর বাঁধানো যে রাস্তাটা শেষ হয়েছে গির্জের প্রবেশ পথের সামনে, —স্যালদান্‌হা পরিবারের দুই ভাইকে নিয়ে এ কাহিনীর শুরু সেইখান থেকেই।

টিপু সুলতানের আমল থেকেই পাওয়া যায় স্যালদান্‌হা বংশের গৌরবময় ইতিহাস। সুমেরু পর্বতের শীর্ষে তাদের বিশাল প্রাসাদ এ অঞ্চলের একটি দর্শনীয় বস্তু।

পিটার স্যালদান্‌হা আর টমাস স্যালদান্‌হা সুপ্রাচীন এই বংশেরই শেষ বংশধর। দু'জনেই অকৃতদার। কিন্তু একজন পরম ধার্মিক, অপরজন বেজায় নাস্তিক।

ঈশ্বর নিয়েই অহর্নিশ বিভোর থাকে রেভারেণ্ড ফাদার পিটার স্যালদান্‌হা; পার্থিব কোনো ব্যাপারে বড় একটা দৃষ্টি নেই। দুষ্ট লোকে বলে নাকি, সৌন্দর্যপ্রীতি স্যালদান্‌হা বংশের নীলরক্তে মিশে আছে। তাই দুশ্চরিত্র টমাস স্যালদান্‌হা যখন নারী আর

সুরার মধ্যে সৌন্দর্য অন্বেষণ করে, ফাদার পিটার স্যালদান্‌হা তখন গথিক ভাস্কর্যের সৌন্দর্যের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান করে বেড়ায়। আসলে পিটার স্যালদান্‌হা নির্জনতাপ্রিয়। তাই এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় বসে গোপন উপাসনা শুরু করে দেয়, যে সাধারণ লোকে ভুল বুঝে বসে। বেদীর বদলে তাকে যদি দেখা যায় গির্জের ঘণ্টা বা গ্যালারী বা গবাক্ষের সামনে নতজানু হয়ে বসে থাকতে, তাহলে এ হেন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

তপনদেবের সপ্ত অশ্বের ছটায় পুব দিক যখন রক্তিম হয়ে উঠেছে, এ গল্পের শুরু তখনই।

বাদশাহী হোটেলের বেঞ্চির ওপর বসেছিল টমাস স্যালদান্‌হা। বয়স হয়েছে। কিন্তু দৃঢ় তেজালো শরীর দেখে তা বোঝার উপায় নেই। অত্যাচারের চিহ্ন তার কোটরাগত দুই চোখে, ঠোঁটের দু'পাশে আধখানা চাঁদের মত সুগভীর ভাঁজে। এক গেলাস চোলাইকরা মদ নিয়ে বসে ছিল টমাস। সারা রাত মাতলামো করেছে সে এবং এইটাই হয়ত তার মঙ্গলবারের সর্বশেষ গেলাস, অথবা বুধবারের সর্বপ্রথম গেলাস। কোন্‌টা যে ঠিক, টমাস, নিজেই তা জানে না।

দুই চোখে অপরিসীম বিতৃষ্ণা নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ভাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল ফাদার পিটার।

একজনের কাছে দিনের শেষ—অপরজনের কাছে দিনের শুরু।

টমাসের পরনে তখনও গতরাতের কালো সান্ধ্য পোশাক। ঠাণ্ডার কবল থেকে বাঁচার জন্যে ওপরে একটা হলদে ওভার-কোট। আর মাথায় একটা কিম্ভূতকিমাকার টুপী। সবুজ বর্ডার আর চওড়া কিনারাওলা এত বড় টুপীর নিচে রক্তচক্ষু শীর্ণ মুখ রীতিমত বেমানান লাগছে। কিন্তু এহেন বিদঘুটে চেহারার জন্যে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই মত্ত টমাসের।

একদৃষ্টে কামারশালার ভেতরে তাকিয়েছিল টমাস। এবং তাই দেখেই থমকে দাঁড়াল পিটার। সন্দিগ্ধ চোখ বুলিয়ে নিলে কামারশালার মধ্যে।

টমাস যদি গির্জের দিকে তাকিয়ে থাকত, তাহলে উঞ্ছ ভাই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ভেতরে চলে যেত পিটার। কিন্তু কামারশালার ভেতরে চেয়ে থাকার ফলেই শুরু হল যত দুশ্চিন্তা।

কারণ, কামার কমল শানভোগের স্ত্রী এ অঞ্চলের ডাকসাইটে সুন্দরী। তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক কানাঘুসোও শোনা যায়।

কাজেই সকালবেলা নারীলোলুপ ভাইকে সন্দেহজনকভাবে বসে থাকতে দেখে পিটারের মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

পাথরবাঁধানো পথের ওপর ফাদার পিটারের দাড়িগোঁফকামানো সৌম্য-মূর্তিকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে দেখেই চমক ভাঙল টমাসের। সঙ্গে সঙ্গে গেলাস তুলে চীৎকার করে উঠল সোল্লাসে—"গুড মর্নিং, পিটার! দেখছো তো, জমি থাকলেই জমিদার হওয়া যায় না। জমিদারের কর্তব্য অনেক। সারা রাত না ঘুমিয়ে প্রজাদের সুখ-সুবিধে দেখেছি আমি। এবার কামার বেটার পালা।"

রাস্তার ওপর চোখ নামিয়ে পিটার বললে—"কামার বাড়ি নেই। ম্যাঙ্গালোর গেছে।"

নিঃশব্দে একচোট হেসে নিয়ে জবাব দিল টমাস—"আমি তা জানি। সেইজন্যেই ওকে ডাকব ভাবছি।"

রাস্তার এক খণ্ড পাথরের ওপর চোখ রেখে বলল পিটার, "টমাস, তুমি কি বজ্রকেও ভয় পাও না ?"

"তার মানে ? তোমার হবি যে আবহাওয়াতত্ত্ব, তা তো জানতাম না।"

চোখ না তুলে বলল পিটার—"রাস্তার মধ্যেই ভগবান তোমার মাথায় বাজ হানতে পারে, তা কি কোনোদিন ভেবে দেখেছো ?"

"বটে, তোমার হবি তাহলে অলৌকিক গাল-গল্প।"

আঁতে ঘা লাগতেই হুংকার দিয়ে উঠল পাদরী পিটার—"তোমার হবি যে জাহান্নমে যাওয়া তা আমি জানি। ঈশ্বরের ওপর ভয়ডর না থাকতে পারে। মানুষকেও কি ডরাও না?"

সকৌতুকে ভুরু তুলল পিটার—"মানুষকে ডরাবো?"

"চল্লিশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে কমল কামারের মত পালোয়ান আর একজনও নেই," কঠিনকণ্ঠে বললে পিটার—"জানি তুমি রোগাপটকা নও, কাপুরুষও নও, কিন্তু তোমাকে পাঁচিল টপকে পাহাড়ের গায়ে ছুঁড়ে দেওয়ার শক্তি সে রাখে।"

কথাটা সত্যি। শুনে একটু থতিয়ে গেল টমাস স্যালদান্‌হা। মুখের দুপাশের আধখানা চাঁদও ঈষৎ ঝুলে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলে নিজেকে। ফিরে এল ক্রুর কৌতুকবোধ। টুথব্রাশ গোঁফের নিচে কুকুর-দাঁতের মত দুটো দাঁত বার করে হেসে উঠল। তাচ্ছিল্যভরে বললে,—"মাই ডিয়ার পিটার, সেইজন্যেই তো স্যালদান্‌হা ফ্যামিলির শেষ বংশধর বর্ম পরেই বেরিয়েছে বাড়ি থেকে।"

বলতে বলতে সবুজ বর্ডার দেওয়া বিদঘুটে টুপীটা খুলে ফেলল টমাস। দেখা গেল, ভেতরটা ইস্পাতের চাদর দিয়ে মোড়া। দেখেই চিনতে পারল পিটার।

দেশবিদেশের হরেকরকম সেকেলে শিরস্ত্রাণ, বর্ম, হাতিয়ার ঝোলানো থাকে স্যালদান্‌হা প্রাসাদের হলঘরে। এ টুপীটা নামানো হয়েছে সেখান থেকেই। খুব সম্ভব চীন বা জাপানের শিরস্ত্রাণ বলেই মনে হল পিটারের।

খুশী-খুশী স্বরে বললে টমাস,—"টুপীই হোক আর মেয়েই হোক —হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই টেনে নেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।"

শান্ত কণ্ঠে পিটার বলল—"কমল কামার যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে।"

বলে আর দাঁড়ালো না। মাথা নিচু করে হন হন করে ঢুকে পড়ল গির্জের মধ্যে। বুকের ওপর ক্রশ এঁকে এমনভাবে অন্তর্হিত হল ভেতরে যেন কোনো দুষ্ট প্রেতাত্মার সান্নিধ্য থেকে সরে যেতে পারলে সে বাঁচে।

গির্জেয় ঢোকার পরেই কিন্তু আর এক দফা চমকে উঠতে হল পিটারকে। এত ভোরে গির্জেতে কেউ থাকে না। কিন্তু সেদিন ধড়মড় করে বেদীর সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল নতজানু এক মূর্তি—লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল আলোকিত দোরগোড়ায়।

অবাক হয়ে গেল পাদরী পিটার। লোকটা আর কেউ নয়, এ গাঁয়েরই সেরা আহাম্মক—কমল কামারের দূর সম্পর্কের ভাইপো। ছোকরা গির্জে-ফির্জে নিয়ে কোনোদিনই মাথা ঘামায় না—অথচ কিনা এত ভোরে ঢুকে বসে রয়েছে ভেতরে।

'পাগলা রামু' নামেই লোকে তাকে ডাকে। এছাড়া আর কোনো নাম তার নেই—থাকলেও কেউ জানে না। আকাট মূর্খ হলেও 'পাগলা রামু'র চেহারাটি দেখবার মত। যেমন লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্যবান। এক নজরেই বোঝা যায়, রীতিমত শক্তিমান। চোখ দুটো গোল গোল, মুখটা সর্বদাই হাঁ-করা।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে রামু পাগলার নিরেট-বোকা মুখে এমন কোন ভাব লক্ষ্য করা গেল না যা দেখে বোঝা যায়, কী মতলবে এত ভোরে গির্জেতে ঢুকেছিল সে।

মেঝেতে স্ক্রু দিয়ে আঁটা মূর্তির মত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিটার। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল পাগলার দিকে। গির্জের বাইরে আলোয় গিয়ে দাঁড়াল রামু। সঙ্গে-সঙ্গে সকৌতুকে হেঁকে উঠল উচ্ছৃঙ্খল টমাস। পাগলা কাছে আসতেই তার মুখের হাঁ-র দিকে তাগ করে ছুঁড়তে লাগল একটির পর একটি পয়সা।

পবিত্র উষার সমস্ত আমেজটুকুই মাটি হয়ে গেল বাইরের এই কদর্য দৃশ্য দেখে। এ কী নিষ্ঠুর আমোদ। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!

বেশীক্ষণ দেখতে পারল না পিটার। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল গ্যালারীর ওপর। এদিক ওদিক করতে করতে এসে দাঁড়াল ভারী সুন্দর একটা রঙীন জানলার সামনে। নীল জানলা। লাল কমল মাথায় নিয়ে উড়ে চলেছে একজন দেবশিশু। জানলাটা পিটারের বড় প্রিয়। এখানে এলেই মন জুড়িয়ে যায় তার —জ্বালা যন্ত্রণা চঞ্চলতার চিহ্নমাত্র থাকে না। এই জানলার সামনেই নতজানু হয়ে বসে আত্মসমাহিত হয়ে রইল পাদরী পিটার। ধীরে ধীরে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে লাগল অনাবিল শান্তির সাগরে। মন থেকে একটু একটু করে মুছে যেতে লাগল দুরাচার ভাইয়ের নোংরা স্মৃতি···ভাই তো নয়, যেন একটা উপোষী শীর্ণ সিংহ, ভয়ংকর ক্ষুধায় হন্যে হয়ে ঘুরছে শিকারের আশায়। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল পিটারের অস্থির চিত্ত, তলিয়ে গেল উদাত্ত আকাশের রূপো মেঘ আর মরকত রশ্মির স্নিগ্ধ, শীতল রঙের দরিয়ায়।

আধ ঘণ্টা পরে এই জানলার নিচেই পিটারকে খুঁজে বার করল নীলকণ্ঠন। নীলকণ্ঠন এ গাঁয়ের একমাত্র ঘড়িওলা। হিন্দু। কাজেই গির্জের মধ্যে জরুরী দরকার না পড়লে তার আসার সম্ভাবনা নেই। তাই ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল পিটার।

কাঁপা হাতে কালো কোট খামচে ধরে জিজ্ঞেস করল—“ব্যাপার কী নীলকণ্ঠন?”

ভাঙা গলায় ফিসফিস করে উঠল নীলকণ্ঠন—“ভয়ানক কাণ্ড। আপনার ভাই—”

শীর্ণ হাত মুষ্টিবদ্ধ করে অস্থির হয়ে উঠল পিটার—“আবার কী করল শয়তানটা?”

“কিছু করেনি। কিছু করবেও না। করা-করির বাইরে চলে গেছেন উনি। দয়া করে নিচে আসুন। নিজের চোখে দেখে যান।”

একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে চট করে নিচে নেমে

এল দু'জনে—রাস্তা থেকে উঁচু একটা রোয়াকের ওপর নেমে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল গোটা দৃশ্যটা। কামারশালার উঠোনে দাঁড়িয়ে জনা পাঁচ-ছয় লোক। একজনের পরনে পুলিশ ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্ম। আর একজন স্থানীয় ডাক্তার। বেঞ্চির ওপর বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কমল কামারের রূপসী বউ। পাশে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে হাত মুখ নেড়ে কি বোঝাচ্ছে একজন অত্যন্ত বেঁটে থলথলে চেহারার পাদরী। এই দলের ঠিক মাঝামাঝি, হাতুড়ির সবচাইতে বড় স্তূপটার ওদিকে, হাত-পা ছড়িয়ে আকাশমুখো হয়ে শুয়ে একজন পুরুষ। পরনে কালো সান্ধ্যপোশাক। উঁচু থেকে সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল পিটার। তাই শায়িত লোকটার মুখচোখ পোশাক তো বটেই, এমন কি অনামিকার আংটিতে স্যালদান্‌হা বংশের জ্বলজ্বলে প্রতীকটিকেও চিনতে দেরী হল না। কিন্তু চেনা গেল না শুধু করোটিটা; বীভৎসভাবে থেঁতলে গেছে মাথাটা; রক্ত মজ্জার সে এক ভয়ানক পিণ্ড।

একঝলকেই যা দেখবার দেখে নিল পিটার স্যালদান্‌হা। পরমুহূর্তেই দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল উঠোনে। ডক্‌টর সিনয় তাকে দেখেই দু'হাত কপালে তুলে নমস্কার করলে। ডক্‌টর সিনয় স্যালদান্‌হা পরিবারের ফিজিসিয়ান। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না পিটারের। কথা বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল তার। কোনমতে তোৎলাতে তোৎলাতে বললে—"টমাস মরে গেছে। কিন্তু কেন? কী ভাবে মরল? নিশ্চয় কোন রহস্য আছে? কে জানে সেই ভয়ানক রহস্য?"

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ্যের পর সবার আগে মুখ খুলল ঠোঁটকাটা নীলকণ্ঠন। বলল—"ভয়ানক নিশ্চয়। কিন্তু রহস্য একফোঁটাও নেই।"

"তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?" নিরক্ত মুখে জানতে চাইলে পিটার।

“এতো খুবই সহজ ব্যাপার। চল্লিশ মাইলের মধ্যে শুধু একজনই এরকম রাক্ষসের মার মারতে পারে। মারার যথেষ্ট কারণও রয়েছে,” বললে ঘড়িওলা।

কালো চাপদাড়ি চুমড়ে নার্ভাস গলায় বললে ডক্‌টর সিনয়—“আমার মনে হয়, আগে থেকেই কাউকে হট্‌ করে সন্দেহ করে বসাটা ঠিক হচ্ছে না। তবে ডাক্তার হিসেবে বলব, নীলকণ্ঠন যা বলেছে, তা কিছুটা সত্য। এরকম চোট বড় একটা দেখা যায় না। অসম্ভব মার। তবে নীলকণ্ঠনের মতে এ জেলায় একজনের পক্ষেই এ-মার সম্ভব। আমার মতে, আর কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়।”

কুসংস্কারের শিহরণ পাদরী পিটারের বিশীর্ণ দেহকে ক্ষণেকের জন্যে কাঁপিয়ে তুলল। শুকনো গলায় বলল—“বুঝতে পারলাম না।”

গলা নামিয়ে বললে ডাক্তার—“ফাদার, উপমা দেওয়াটা আমার ধাতে নেই। মাথার খুলিটা ডিমের খোলার মত চুরমার হয়ে গেছে বললেও সব বলা হয় না। হাড়ের কুচোগুলো ঢুকে গেছে মাথার মধ্যে—কাদার দেওয়ালে বুলেট গেঁথে যাওয়ার মতই ঘিলুর মধ্যে হারিয়ে গেছে কুচোগুলো। দৈত্য না হলে এত শক্তি কোনো মানুষের হাতে থাকতে পারে না।”

মুহূর্তের জন্য চুপচাপ রইল ডাক্তার। চশমার মধ্যে দিয়ে ওপাশের নিষ্প্রাণ দেহটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে নীরস গলায়—“একটা সুবিধে আছে। প্রথম চোটেই যে-কোন মানুষের ওপর থেকে সন্দেহ সরে যাচ্ছে। আপনি আমি অথবা আমাদের মতই সাধারণ মানুষের কাঁধে এ অপরাধ চাপিয়ে দেওয়াটা যতখানি অসম্ভব, ঠিক ততখানি অসম্ভব এক বছরের শিশুর কাঁধে সুমেরু পাহাড়ের বোঝা চাপিয়ে তাকে হাঁটতে বলা।”

একগুঁয়ে গলায় তবুও বললে ঘড়িওলা—"আমিও তাই বলি। সাধারণ লোকের কাজ এটা নয়। শুধু একজনের পক্ষেই সম্ভব—আর কারো পক্ষে নয়। কমল কামার কোথায় ?"

"ম্যাঙ্গালোরে", আমতা আমতা করে বলল পিটার।

"ম্যাঙ্গালোর ছাড়িয়ে এতক্ষণে বোধহয় ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে গেছে", বিড়-বিড় করে বলল ঘড়িওলা।

"না, দু'জায়গার কোনোখানেই নেই কমল কামার", পিন্‌পিন্ গলায় কথা কয়ে উঠল একটা সাদামাটা কণ্ঠ ; থলথলে চেহারার সেই পাদরী। "সত্যি কথা বলতে কি এই মুহূর্তে এই রাস্তা দিয়েই এদিকে আসছে সে।"

তাকিয়ে দেখার মত চিত্তাকর্ষক চেহারা নয় ক্ষুদে পুরুতের। উস্কোখুস্ক চুল ; গোলগাল নির্বোধ মুখ। কিন্তু কন্দর্পের মত দিব্যকান্তি থাকলেও তখন তার দিকে নজর দেওয়ার মত মনের অবস্থা ছিল না কারুরই। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখা গেল পাথর-বাঁধানো সুদীর্ঘ রাস্তাটা একেবারে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। ঢাল বেয়ে সত্যিসত্যিই উঠে আসছে কমল শানভোগের দৈত্যমূর্তি। দেহের আধখানা মাত্র দেখা যাচ্ছে—কোমর থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টির অন্তরালে। কাঁধের ওপর একটা মস্ত হাতুড়ি। দেহে মেদ নেই এক-ছটাকও—শুধু মোটা মোটা হাড় আর মাংসপেশী। বিরাট মুখ, কোটরাগত দুই চোখে তীব্র নির্মম দৃষ্টি। দেখলে ভয় লাগে। দেখতে দেখতে ওপরে উঠে এল কমল—দেখা গেল পেছনে রয়েছে আরও দুজন লোক। স্বচ্ছন্দস্বরে এদের সঙ্গেই কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে সে।

চাপাগলায় চীৎকার করে উঠল ঘড়িওলা—"দেখেছেন! হাতুড়িটাও নিয়ে আসছে!"

"না," বলল ইন্সপেক্টর। যুক্তিমার্জিত ছিমছাম চেহারা

ভদ্রলোকের। মুখ খুলল এই প্রথম—"যে হাতুড়ি দিয়ে মাথা ফাটিয়েছে—সেটা কাঁধে নেই—রয়েছে ওদিকে…গির্জের দেওয়ালের পাশে। লাশ আর হাতুড়ি যেভাবে ছিল সেইভাবেই রেখে দিয়েছি—একটুও নড়াইনি।"

দম দেওয়া পুতুলের মত ঘুরে দাঁড়াল সবাই। ক্ষুদে পুরুৎ ক্ষুদে ক্ষুদে পা ফেলে গুটগুট করে এগিয়ে গেল দেওয়ালের পাশে। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল হাতুড়িটার দিকে। সবচাইতে ছোট্ট আর সবচাইতে হাল্কা একটা হাতুড়ি। রাশি রাশি হাতুড়ির মধ্যে এ হাতুড়ির দিকে চোখপড়ার কথা নয়। পড়তও না। যদি না লোহার কিনারায় লেগে থাকত রক্ত আর চুল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর কথা কইল বেঁটে পাদরী। নতুন সুর শোনা গেল তার বোকা-বোকা স্বরে—"মিঃ নীলকণ্ঠন যা বললেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। রহস্য নেই, কথাটা ঠিক নয়। রহস্যই যদি না থাকবে তো কমল কামারের মত এরকম বিশাল পুরুষ এত ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে এত বড় মার মারতে যাবে কেন শুনি? রহস্য এইটাই—আর কিছু নয়।"

ক্ষিপ্তের মত চেঁচিয়ে উঠল ঘড়িওলা নীলকণ্ঠন—"ওসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না আপনাকে, কমল কামারকে এখন সামলাবেন কী করে, তাই ভাবুন।"

শান্তস্বরে ক্ষুদে পাদরী বলল—"তা নিয়ে অন্তত আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। কমল কামার স্বেচ্ছায় এদিকে আসছে—সঙ্গের লোকদুটোকেও আমি চিনি। ম্যাঙ্গালোরে থাকে। মানুষ ভাল।"

কথা শেষ না হতে হতেই গির্জের কোণ ঘুরে উঠোনে পা দিল দীর্ঘাকৃতি কমল কামার। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মত আড়ষ্ট দেহে দাঁড়িয়ে পড়ল সেইখানেই। কাঁধ থেকে মাটিতে খসে পড়ল

হাতুড়িটা। এক সেকেণ্ডও দেরী না করে সামনে গিয়ে দাঁড়াল পুলিশ ইন্সপেক্টর।

"কমল, যা দেখছ, তা নিয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করব না আমি, তোমাকেও কিছু বলতে দেব না। এ ব্যাপারের কিছুই যে তুমি জানো না, তা যে তুমি প্রমাণ করতে পারবে, সে আশা আমি রাখি। কিন্তু এই মুহূর্তে টমাস স্যালদান্‌হাকে খুন করার অপরাধে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করছি।"

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে বলল ঘড়িওলা—"তোমাকে কোনো কথাই বলতে হবে না—পুলিশই সব প্রমাণ করে দেবে। লোকটা যে টমাস স্যালদান্‌হা, তাই তো এখনও প্রমাণ হয়নি। মাথাটা এমনভাবে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে যে চেনাই মুস্কিল।"

ডাক্তার বললেন—"ওসব ডিটেকটিভ গল্পে মানায়—ও যুক্তি এখানে চলবে না নীলকণ্ঠন। আমি মিঃ স্যালদান্‌হার একমাত্র ডাক্তার—টমাস স্যালদান্‌হা নিজের দেহকে যতটা না জানতেন, তার চাইতে বেশী জানি আমি। ও হাত ভোলবার নয়। তর্জনী আর মধ্যমা—দুটো আঙুলই লম্বায় সমান। না, মশাই, না, ও লাশ টমাস স্যালদান্‌হা ছাড়া আর কারো নয়।"

নিষ্কম্প দেহে দাঁড়িয়েছিল কমল কামার—লৌহচক্ষু নিবদ্ধ ছিল গতায়ু দেহটার ওপর। সেইভাবেই দাঁড়িয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত সহজ গলায় বললে—"টমাস স্যালদান্‌হা মরে গিয়ে থাকলে বলব, আপদ গেছে।"

"সে কী কথা! সে কী কথা! মুখ খুললেই বিপদ! কথা বলো না," প্রায় নেচে উঠে বলল ঘড়িওলা নীলকণ্ঠন।

দুই চোখে ঘৃণাবৃষ্টি করে ঘড়িওলার দিকে তাকাল কমল কামার। কণ্ঠে ততোধিক ঘৃণা ঢেলে বললে—"আমি মুখ খুলি না খুলি, তা নিয়ে আপনার কুমীরের কান্নার দরকার নেই। বিপদ আমাকে ছুঁতে পারে কিনা, তা আপনাদের সবার সামনে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

Siliguri College
Library
(Evening Dept.)
No. 3596

বলে ইঙ্গিতে সঙ্গী দুজনকে ডাকল কমল। দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিল তারা। ভেতরে আসতেই ভরাট গলায় বলল দানব কামার—"এদের দুজনকেই আপনারা প্রায় সবাই চেনেন। ব্যাঙ্গালোরের চিকপেটে আর ম্যাঙ্গালোরের মার্কেট রোডে দুজনেরই লোহা-লক্কড়ের বড় কারবার আছে। তার আগে একটা প্রশ্ন : "কুত্তাটা কখন মারা গেছে ?"

"মার্জিত ভাষায় কথা বল," ঝটিতি বলল ডাক্তার।

ভ্রূক্ষেপ না করে আবার জিজ্ঞেস করল কমল—"কখন মারা গেছে শুয়োরটা ?"

রক্তহীন মুখে জবাব দিল পিটার—"ভোর ছ'টার সময়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছি আমি—এইখানেই।"

"চমৎকার। এবার শুনুন এদেরই মুখে, গতকাল সন্ধ্যে ছ'টা থেকে আজ ভোর ছ'টা পর্যন্ত কোথায় ছিলাম, কি করছিলাম। কার সঙ্গে ছিলাম।"

গ্র্যানাইট কঠিন মুখে জেরা শুরু করল ইন্সপেক্টর। কিন্তু সেদিকে ক্ষুদে পুরুতের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। অন্যমনস্কভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেওয়ালের পাশে পড়ে থাকা ছোট্ট হাতুড়িটার দিকে।

জেরা শেষ হল। বিদ্রূপভরে বললে কমল কামার, "ইন্সপেক্টরসাব, গ্রেপ্তার হতে আমার একটুও আপত্তি নেই। অনায়াসেই ফাটকে পুরতে পারেন আমাকে। কিন্তু কোর্ট থেকে আমি বেরিয়ে আসব আপনার মুখে চুনকালি দিয়ে। বলুন কী চান। এরপরেও হাতকড়া লাগাতে চান তো, নিন, দিলাম হাত বাড়িয়ে।"

নিরুত্তর মুখ অন্ধকার করে রইল ইন্সপেক্টর। উত্তর দেওয়ার মত কিছু ছিলও না। কমল কামারের গতিবিধির সাক্ষী শুধু এই দু'জন ব্যবসায়ীই নয়, শহরের আরো অনেকে। ভোর পাঁচটার

সময় বাসে চেপেছে তিনজনে—টমাসের মাথা থেঁতো হওয়ার সময়ে তারা চলন্ত বাসে।

গির্জের মত নিরেট দেহ সিধে করে মুচকিমুচকি হাসতে লাগল কমল শানভোগ।

সব চুপ। কারো মুখে কথা নেই। ভাষা হারিয়ে মুখচাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে বাকী সকলে। কথা বলার চাইতে এ নৈঃশব্দ্য আরো যন্ত্রণাদায়ক।

শেষকালে আর চুপ করে না থাকতে পেরে কিছু একটা বলার জন্যেই মুখ খুলল পিটার। অসংলগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করল ক্ষুদে পাদরীকে—"মনে হচ্ছে হাতুড়িটা নিয়ে মহাচিন্তায় পড়েছেন, ফাদার মণ্ডল ?"

"তা পড়েছি", জবাব দিল ফাদার মণ্ডল ; "হাতুড়িটা এত ছোট কেন ?"

চট করে ঘুরে দাঁড়াল ডক্টর সিনয়।

"সত্যিই তো, দশগুণ বড় হাতুড়ি আশপাশে এত পড়ে থাকা সত্ত্বেও এত ছোট হাতুড়ি কি কেউ নেয় ?"

তারপরেই পাদরী পিটারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে খাটোগলায় : "শুধু একজাতীয় মানুষই বড় হাতুড়ি তুলতে পারে না। পুরুষ বা নারীর মধ্যে কে বেশী সাহসী অথবা কে বেশী শক্তিমানের প্রশ্ন এটা নয়। প্রশ্ন হল মাথার ওপরেও তুলে ধরার ক্ষমতা। যে স্ত্রী-লোকের সাহস আছে, ইচ্ছে করলে সে হাল্কা হাতুড়ি দিয়েও দশ-দশটা খুন করতে পারে—চোখের পাতা একটুও কাঁপবে না। কিন্তু ভারী হাতুড়ি দিয়ে একটা গঙ্গাফড়িং মারবার ক্ষমতাও তার হবে না।"

দুই বিস্ফারিত চোখে সম্মোহিত আতংক নিয়ে ডাক্তারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল পিটার স্যালদান্‌হা। কিন্তু ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল একপাশে মাথা কাৎ করে শুনছিল মন

দিয়ে। এমন নিবিষ্ট হয়ে কানখাড়া করেছিল, যেন অত্যন্ত দুরূহ ধর্মতত্ত্বের প্রাঞ্জলব্যাখ্যা শোনাচ্ছে ডক্টর সিনয়।

আরও ফিসফিসিয়ে আরও হিসহিসিয়ে বলে চলল ডক্টর ঃ

"স্ত্রীর উপপতিকে কেবল স্ত্রীর স্বামীই ঘৃণা করে, এমন ধারণা স্রেফ বোকাদের মাথাতেই আসে। দশটা কেসের মধ্যে নটা ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, স্ত্রীর উপপতিকে সবচাইতে বেশী ঘৃণা করে স্ত্রী স্বয়ং। কে জানে এ ক্ষেত্রেও এই মেয়েটির সঙ্গে হয়ত এমন কোনো বিশ্বাসঘাতকতা, এমন কোনো নতুন নষ্টামি মিঃ টমাস স্যালদান্‌হা —দেখুন, দেখুন, কমলের বৌকে দেখুন!"

বেঞ্চির ওপর কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে বসে ছিল কমলপত্নী। এখন মুখ তুলেছে সে, অপরূপ সুন্দর মুখে তখনও অশ্রু পুরোপুরি শুকোয়নি। লাশটার দিকে তাকিয়ে ছিল নিষ্পলক চোখে, কিন্তু সেকি বৈদ্যুতিক প্রখরতা দুই কৃষ্ণ চোখে।

হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগল পিটার স্যালদান্‌হা। হাতার ওপর থেকে চুল্লীর ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অন্যমনস্কভাবে বললে ফাদার ঘনশ্যাম ঃ

"সব ডাক্তারের মত আপনিও। আপনাদের মানসিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই ইঙ্গিতপূর্ণ। কিন্তু আপনাদের শারীরিক বিজ্ঞানটাই একেবারেই অসম্ভব। আমি মেনে নিচ্ছি, বকাটে উটকো প্রেমিকদের ওপর মেয়েদের যতটা রাগ থাকে, স্বামীদের হয়ত ততটা থাকে না। একথাও মেনে নিচ্ছি যে ভারী হাতুড়ি ছেড়ে যে কোনো মেয়েই হাল্কা হাতুড়িই বেছে নেবে মাথায় বসানোর জন্যে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে শারীরিক অসম্ভাব্যতা। এমন কোনো মেয়ে পৃথিবীতে আজও জন্মায়নি যে মানুষের খুলি এভাবে চ্যাপ্টা করে থেঁতো করতে পারে," একটু থেমে কী যেন ভাবতে ভাবতে আবার বললে ঃ 'কেউই আসলটা ধরতে পারেননি। টমাস স্যালদান্‌হা, আসলে একটা লোহার হেলমেট পরেছিলেন। হাতুড়ির

ঘায়ে কাঁচের মতই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে হেলমেটটা। এবার দেখুন কমলের বৌয়ের দিকে। দেখুন ওর হাতের দিকে।"

আবার টুঁ টিটেপা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল সবাই। তারপর কিন্তু-কিন্তু করে বলল ডক্টর ঃ "বেশ, ভুল আমার হতে পারে। সব থিওরীর মধ্যেই দেখছি আপত্তির খোঁচা রয়েছে। কিন্তু মূল পয়েন্ট আমি ছাড়ছি না। নেহাৎ নিরেট মুর্খ ছাড়া কেউই এত ভারী হাতুড়ি পড়ে-থাকা সত্ত্বেও ঐটুকু হাতুড়ি নিতে যাবে না।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই আচম্বিতে থর থর করে কেঁপে উঠল পিটার স্যালদান্‌হা। রোগা রোগা দশটা আঙুল দিয়ে খামচে ধরল মাথার চুল। ক্ষণপরেই হাত নামিয়ে বললে রুদ্ধশ্বাসে—"এই শব্দটাই খুঁজছিলাম—আমি পাইনি—কিন্তু আপনি পেয়েছেন।"

হতভম্ব হয়ে গেল উপস্থিত সবাই। সেদিকে লক্ষ্য ছিল না পিটারের। আপন মনে বলে চলেছিল তড়বড় করে—"এইমাত্র বললেন না, নেহাৎ নিরেট মূর্খ ছাড়া কেউই ঐটুকু হাতুড়ি নিতে যাবে না।"

"তা তো বলেইছি", বলেন ডাক্তার। "তাতে হয়েছে কি?"

"এ কাজ নিরেট মূর্খ ছাড়া আর কেউই করেনি।"

বলতেই চমকে উঠে সবাই তাকিয়ে রইল পিটারের মুখের দিকে। পিটার ততক্ষণে উত্তেজিতভাবে মেয়েদের মত হাত-মুখ নেড়ে শুরু করে দিয়েছে।

"আমি পুরুৎ। কোনো পুরুতেরই উচিত নয় রক্তপাত করা, ইয়ে, মানে, কাউকে ফাঁসিকাঠে তোলাটা পুরুতের কাজ নয়। কিন্তু ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। তাই খুনী যে কে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই নেই আমার মনে। সন্দেহ নেই এই কারণে যে, এ খুনীকে কোনোদিনই ফাঁসিকাঠে উঠতে হবে না।"

"খুনীর নামধাম চেপে যাবেন নাকি?" জানতে চাইল ডাক্তার।

“চেপে না গেলেও ফাঁসির দড়িতে তাকে ঝুলতে হবে না”, জবাব দিলে পিটার; বেপরোয়া কিন্তু অদ্ভুত তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ওষ্ঠপ্রান্তে। “আজ ভোরে গির্জেতে ঢুকেই দেখেছিলাম পাগলা রামুকে বেদীর সামনে বসে থাকতে। পাগলা রামুর পাগলামির সীমা নেই। কিন্তু কি খেয়ালে আজ গির্জেতে ঢুকেছিল, বেদীর সামনে বসে কি প্রার্থনা জানাচ্ছিল, তা জানি না। শুনেছি অনেক সময়ে বদ্ধ পাগলরা খুন করার আগে ভগবানের নাম নেয়। শেষবার পাগলা রামুকে আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখেছি। রামুর মুখের হাঁ’র ভেতরে পয়সা ছুঁড়ছিল টমাস। এক্ষেত্রে টমাসই জ্ঞানপাপী। রামু অজ্ঞান পাপী।”

“সর্বনাশ! কিন্তু আপনি—”

ডাক্তারকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আবার শুরু করল পিটার। নিদারুণ উত্তেজনায় সমস্ত দেহ কাঁপছিল তার। জ্বরতপ্ত রুগীর মত গলা কাঁপিয়ে বললে—“একই সঙ্গে দু-দুটো ধাধাঁর উত্তর, দু-দুটো অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা শুধু এই একটা থিওরী দিয়েই পাওয়া যায়। আপনারা নিজেরাও ভেবে দেখুন। দুটো ধাধাঁর একটা হল ছোট হাতুড়ি, অপরটা, প্রচণ্ড মার। কমল কামার প্রচণ্ড মার মারলেও মারতে পারে। কিন্তু ছোট হাতুড়ি তার মনে ধরত না। ছোট হাতুড়ি তার বউয়ের পছন্দ হত বটে, কিন্তু অমন প্রচণ্ড মার সে মারতে পারত না। তবে পাগলের পক্ষে দুটোই সম্ভব। ছোট হাতুড়ি? যে পাগল, তার কি বাছ-বিচার থাকে? প্রচণ্ডমার, ডাক্তার আপনি তো জানেনই উন্মাদ খেপে উঠলে একাই দশটা লোকের সমান শক্তিমান হয়ে ওঠে।”

চকিতে গভীর শ্বাস নিয়ে বলল ডাক্তার—“গুড গড, কথাটা মিথ্যে বলেননি।”

আগাগোড়া নিষ্পলক চোখে পিটার স্যালদান্‌হার দিকে তাকিয়ে ছিল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। আর সবার মত সে চোখে

নেই তারিফ, বিস্ময়, উচ্ছ্বাস। পিটার নীরব হতেই সূচীভেদ্য স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সশ্রদ্ধভাবে বলল—"মিঃ স্যালদান্হা, আপনার থিওরীই একমাত্র থিওরী, যে থিওরী বানচাল হবার সম্ভাবনা নেই একটুকুও। যুক্তি আপনার অকাট্য। সেই কারণেই আপনার জানা দরকার যে থিওরীটা মোটেই সত্যি নয়।" বলে, অদ্ভুতদর্শন খর্বকায় পাদরী দল ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল হাতুড়িটার দিকে।

পিটারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বলল ডাক্তার—"লোকটার যতখানি জানা উচিত, তার চাইতেও অনেক বেশী খবর রাখে মনে হচ্ছে? কুমড়োর মত চেহারা হলে কি হবে, বুদ্ধিশুদ্ধি ক্ষুরের মতই ধারালো নাকি?"

"না-না" কণ্ঠে অপরিসীম ক্লান্তি ঢেলে ক্ষীণ স্বরে ক্ষিপ্তের মত বলে উঠল পিটার—"খুনী ঐ পাগলটা! আর কেউ নয়!"

দল ছেড়ে একটু সরে এল ডাক্তার আর পাদরী দুজন। জোর গলায় ইনস্পেক্টরকে প্রশ্ন করল কমল কামার—"আমাকে কি এখনও আটকে রাখবেন? ম্যাঙ্গালোর থেকে হাতুড়ী ছুঁড়ে সুমেরু পাহাড়ে পাঠাবার মত ক্ষমতা নিশ্চয় আমার নেই। হাতুড়ির গায়ে তো আর ডানা গজায়নি যে মাঠবন টপকে এত মাইল দূরে ঐ কুত্তার মাথায় পড়বে।"

শুনে শুধু একবার চোখ তুলে ওপরে তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে নিল ফাদার মণ্ডল। ইনস্পেক্টর হেসে ফেলল। বললে—"না। তা অবশ্য নেই। কাজেই রেহাই দেওয়া গেল তোমাকে। কিন্তু এরকম অদ্ভুত কাকতালীয় আর দেখিনি। যাকগে, তোমার মতই পালোয়ান খুনীকে পাকড়াও করতে গেলে তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে। নিশ্চয় তা পাবো। হত্যাকারী কে, তা নিশ্চয় আঁচ করতে পারছ?"

ফ্যাকাশে মুখে কমল কামার বলল—"মনে হচ্ছে পারছি। কিন্তু সে মানুষ নয়।" বলে, তাকালে স্ত্রীর দিকে। মুখ নিচু করে বেঞ্চির ওপর বসে ছিল কামার বউ। গাঢ় দৃষ্টি মেলে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কমল। তারপর বউয়ের কাঁধের ওপর বিশাল হাত রেখে বললে—"মানুষীও নয়।"

চোখ নাচিয়ে ইনস্পেক্টর জিজ্ঞেস করলে—"তার মানে? আজকাল গরুরাও হাতুড়ি চালাচ্ছে নাকি?"

কাঠখোট্টা গলায় কমল কামার বলল—"কোনো রক্ত-মাংসের প্রাণী হাতুড়ি চালিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস কেউ ওকে মারেনি, ও নিজেই মরেছে।"

হঠাৎ এগিয়ে এসে জ্বলন্ত চোখ পাকিয়ে বলল পিটার—"কমল, তুমি বলতে চাও, হাতুড়িটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠে টমাসের মাথায় এসে পড়েছে?"

"দুর্জনকে নাশ করতে হলে ভগবান নিজেই নেমে আসেন," বিড়বিড় করে বলল কমল কামার।

থমকে গেল পিটার। জড়িত স্বরে বললে অনেকক্ষণ পরে—"মাথায় বাজ পড়ার কথা আমিও টমাসকে বলছিলাম আজ সকালে।"

মুচকি হেসে বলল ইনস্পেক্টর—"এ জিনিসটা আমার আওতার বাইরে পড়ে।"

"তা ঠিক। কিন্তু ভগবানের আওতার বাইরে আপনি নন," বলে, পিছু ফিরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল কমল কামার।

মুহ্যমান পিটারকে নিয়ে এগিয়ে গেল ফাদার ঘনশ্যাম। বলল—"ভয়ানক জায়গাটা ছেড়ে আগে বাইরে যাওয়া যাক। গির্জের মধ্যেটা কিন্তু এসে পর্যন্ত দেখা হয়নি। শুনেছি, মাইশোরে এর চাইতে পুরোনো গির্জে নাকি আর একটিও নেই। আমার আবার এদিকে একটু বাতিক আছে।" বলে হাসল মুখভঙ্গী করে—"পুরোনো গির্জে দেখার বাতিক।"

পিটার স্যালদান্‌হা কিন্তু হাসল না। হাসি এসময়ে আসে না। রসবোধও থাকে না। কিন্তু মনটাকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই বলে উঠল—"নিশ্চয়, একশবার, চলুন ভিতরে যাওয়া যাক।"

ভেতরে গিয়ে এগুলো উঁচু রোয়াকটার দিকে। তরতর করে রোয়াকের ওপর গিয়ে দাঁড়াল পিটার। ফাদার মণ্ডল সবে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময়ে পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখল ডক্টর সিনয়।

বলল কর্কশ গলায়—"অনেক খবরই রাখেন মনে হচ্ছে। কিছু কিছু সিক্রেট জানতে পারি কি ?"

একগাল হেসে জবাব দিল ফাদার ঘনশ্যাম—"জানেন তো আমার পেশার একটা নীতি হল গোপন কথা গোপনেই রাখা। কিন্তু তাতে যদি কিছু অসৌজন্য প্রকাশ করে থাকি বলে আপনার মনে হয়, তাহলে এ নীতির চরম সীমায় যেতে আমি প্রস্তুত। দুটো খুব জোরদার ইঙ্গিত আপনাকে দেব।"

"বটে ?" সন্দিগ্ধভাবে বলল ডাক্তার।

হাসি হাসি মুখেই বলে চলল ফাদার—"ইঙ্গিত হল এই যে, এ ব্যাপার পুরোপুরি আপনার এক্তিয়ারে। রহস্যটা পদার্থ বিজ্ঞান ঘটিত। কমল কামার যা বলল, তার কিছুটা ঠিক, কিছুটা বেঠিক। এ মার ভগবানের মার নয়, তবে একে মির‍্যাকল বলা যায় নিঃসন্দেহে। যে শক্তি মাথার খুলি গুঁড়ো করেছে, সে শক্তি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন বহু বছর আগেই। প্রকৃতির এই বিশেষ আইন নিয়ে আজও শেষ নেই বৈজ্ঞানিক তর্ক-বিতর্কের।"

ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে ছিল ডক্টর। পাদরী মণ্ডল থামতেই প্রশ্ন করল—"দু নম্বর ইঙ্গিত ?"

"দুনম্বর ইঙ্গিতটা হল একটা রূপকথা। শুনলেন তো, একটু আগেই কমল কামার বলছিল হাতুড়ির গায়ে ডানা লাগানো থাকলে এত মাইল দূর থেকে এখানে তা পাঠানো যেত।"

"তা শুনেছি।"

আকর্ণ হেসে বলল ফাদার ঘনশ্যাম—"আজকের আসল সত্যের অনেকটা কাছে আসে রূপকথাটা।"

বলে, পিছু ফিরে ওপরে উঠে গেল গট গট করে।

অধীরভাবে ওপরে দাঁড়িয়েছিল রেভারেণ্ড পিটার স্যালদান্‌হা। ফ্যাকাশে মুখে সেকি অস্থিরতা। যেন এইটুকু দেরী হওয়ার ফলেই স্নায়ুমণ্ডলীর সমস্ত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। ফাদার মণ্ডল উঠে আসতেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল প্রিয় জানলার সামনে—ঢালু ছাদ যেখানে শেষ হয়েছে, যেখানে দেবশিশুর লাল কমল আর জানলার নীল কাঁচের মধ্যে দিয়ে ধরণীকে মনে হয় অপরূপ অতুলনীয়।

যা দেখে তাই ভাল লাগে বামন পাদরীর। শতমুখে তারিফ করে সব কিছুরই। যতি দেয় না অবিরাম বকবকানির মধ্যে। হঠাৎ চোখে পড়ে জানলার ওপাশে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়েই ভাইয়ের মৃত্যুদশা দেখতে নেমে গেছিল পিটার স্যালদানহা। চাতালে দাঁড়িয়ে নিচে না নেমে মর্কটের মত ক্ষিপ্র বেগে ওপরে উঠে গেল বেঁটে ঘনশ্যাম। ওপরের চাতাল থেকে শোনা গেল তার চাঁচাছোলা স্বর।

"মিস্টার স্যালদানহা, উঠে আসুন মশাই। তাজা বাতাসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।"

অগত্যা ওপরে উঠল পিটার। সিঁড়ির পরেই চাতালটা। চাতাল না বলে তাকে বারান্দা বলা উচিত। পাথরের বারান্দা। পাথরের পাঁচিল। মূল গির্জে থেকে বেরিয়ে আসা ঝোলানো বারান্দা। এখানে দাঁড়ালে চোখে পড়ে সীমাহীন প্রান্তর—যে প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে সুমেরু পর্বত এবং যে পর্বতের শীর্ষে এই গির্জে। রুক্ষ প্রান্তর নয়, সবুজ শ্যামল বনভূমি বিস্তীর্ণ কার্পেটের মতই ছড়িয়ে রয়েছে মরকত দিগন্ত পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে বিন্দুর মত গ্রাম আর গোলাবাড়ি। ফিতের মত সরু রাস্তা। পশ্চিমে আরব সাগরের ধূ-ধূ বিস্তার। অনেক নিচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

বর্গক্ষেত্রের মত কমল কামারের কামারশালা। উঠোনে দাঁড়িয়ে নোট লিখছে ইনস্পেক্টর। পাশেই থেঁতলানো মাছির মত পড়ে লাশটা।

"ঠিক যেন পৃথিবীর ম্যাপ," আশ্চর্য শান্তস্বরে বলল ফাদার ঘনশ্যাম।

"তাই বটে", অত্যন্ত গম্ভীরমুখে সায় দিল পিটার।

নিচের আর চারপাশের পাথরের বাড়িগুলো যেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে বাইরের প্রান্তরের নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে। গা-গুলোনো সেই অনুভূতিকে ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এ যেন আত্মহত্যার পূর্ব অনুভূতি।

প্রাচীন এই গির্জার প্রতিটি পাথরে লেখা সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। যুগ যুগের মৌন সাক্ষী তারা। আজ সে পাথরে শ্যাওলা আর ব্যাঙের ছাতার দৌরাত্ম্য, পাখির বাসার চিহ্ন। কিন্তু এই গির্জেরই পাদদেশে দাঁড়িয়ে জেগেছিল এক বিচিত্র অনুভূতি। মনে হয়েছিল যেন অকল্পনীয় ফোয়ারার মতই লাফিয়ে উঠে নক্ষত্রপট স্পর্শ করতে চাইছে শীর্ষদেশ। কিন্তু চুড়োয় দাঁড়িয়ে নীচে তাকিয়ে মনে হল এ যেন এক বিপুল জলপ্রপাত—তলহীন অসম্ভব খাদের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চাইছে নিজেকে। দূর-দূরান্তের দৃশ্যে নেই কোনো অনুপাত—সে এক দানবিক বিকৃতি ঃ সে দৃশ্যের দিকে একনাগাড়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাথা ঘুরে ওঠে, দৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে ; বিশাল জিনিসগুলো যেন অকস্মাৎ গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে, ছোট্ট জিনিসগুলো পেয়েছে বিশাল আকার ; যেন শূন্যে ভাসমান প্রস্তরনগরীর উল্টো-পাল্টা লণ্ডভণ্ড দৃশ্যপট। ডানামেলা পাখিগুলোকে মনে হচ্ছে উড়ন্ত ড্রাগনের মত—বহু নীচে রয়েছে মাঠবন প্রান্তর গৃহের বিন্দু বিন্দু চিত্র। সব মিলিয়ে গোটা ছবিটাই বিপজ্জনক কুয়াশার মতই অস্পষ্ট অথচ ভয়ানক—যেন বায়ুপথে অতিকায় পরীর ডানায় বসা মানুষের চোখে আচম্বিতে ধরা পড়েছে

সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উথালিপাথালি দুরন্ত এক দৃশ্য। রোদ্দুর ঝকমকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ওপারে সুপ্রাচীন এই গির্জে যেন একখণ্ড ভাসমান মেঘ।

ফাদার ঘনশ্যাম বললে—"এত উঁচুতে দাঁড়িয়ে ভগবানের নাম নেওয়া খুবই বিপজ্জনক। উঁচু জায়গার সৃষ্টি হয়েছে কেবল নিচ থেকে দেখার জন্যে, উঁচু থেকে নীচে দেখার জন্যে নয়।"

"মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে, তাই তো?" প্রশ্ন করল পিটার।

"দেহটা না পড়লেও আত্মাটা তো পড়তে পারে", জবাব দিল ঘনশ্যাম।

"ঠিক ধরতে পারলাম না", ক্ষীণকণ্ঠে বলল পিটার।

প্রশান্ত কণ্ঠে বলল ফাদার মণ্ডল—"পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের সব কিছুই ছোট মনে হয়—কিন্তু নিচ থেকে আকাশকে মনে হয় বিশাল।"

চুপ করল ঘনশ্যাম। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে। অনেকক্ষণ পরে বললে গাঢ়স্বরে—"আমি এক ভদ্রলোককে চিনতাম। আর পাঁচজনের মতই বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে সাধনভজন শুরু করেছিল সে। কিন্তু পরে দেখা গেল, বেদীর চাইতে উঁচু জায়গার নিরালা কোণই তার বেশী পছন্দ। গির্জের ঘণ্টা, গ্যালারীর জানলা—এই সব জায়গাই আস্তে আস্তে প্রিয় হয়ে উঠল তার কাছে। একদিন এই রকমই একটা বেজায় উঁচু বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সে; মনে হচ্ছিল, যেন গোটা পৃথিবীটাই ছোট্ট একটা চাকার মত ঘুরছে বহু নিচে; দেখে তার নিজেরই মাথা ঘুরে গেল; নিজেকে মনে হল সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাই একটা মস্ত অপরাধ করে বসল সেইখান থেকেই।"

মুখ ঘুরিয়ে নিল পিটার স্ন্যালদান্‌হা। কিন্তু সরু সরু আঙুল দিয়ে এত জোরে পাথরের পাঁচিল আঁকড়ে ধরল যে শিরাগুলো নীল হয়ে ফুলে উঠল, রক্তহীন হয়ে গেল নখগুলো।

সে ভাবলে সংসারের ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার ক্ষমতা সে পেয়েছে—পেয়েছে পাপীকে দণ্ড দেওয়ার অধিকার। আর সবার মত মাটিতে বসে ঈশ্বর উপাসনা করলে হয়ত এ কল্পনা কস্মিনকালেও আসত না তার মাথায়। কিন্তু ওপর থেকে সে দেখলে, পোকামাকড়ের মতই ঘুরছে নিচের লোকগুলো। বিশেষ করে এক-জনকেই চোখে পড়ল তার। ঠিক নিচেই লোকটার ঝকঝকে সবুজ টুপীটা এক[illegible] মতই উদ্ধত হয়ে পীড়া দিচ্ছিল চোখকে।”

M.B.S. PATHAGAR
Accn. No. 3338
Call No.

মাথার ওপর কা-কা করে উঠল একটা কাক। দম নিয়ে আবার আরম্ভ করল ফাদার মণ্ডল—“প্রকৃতির একটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্র হাতে ছিল তার। ফলে, আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারল না সে। অমোঘ সেই অস্ত্র আর কিছুই নয়—মাধ্যাকর্ষণ। যার প্রচণ্ড আকর্ষণ দিয়ে ধরিত্রী তার প্রতিটি প্রাণীকে ধরে রেখেছে নিজের কোলে। দেখছেন তো, কামারশালায় ঘুর ঘুর করছেন ইন্সপেক্টর। ভদ্রলোকের মাথা টিপ করে একটা নুড়িও যদি ফেলি এত উঁচু থেকে, তাহলে মাথার কাছে গিয়ে নুড়িটা বুলেটের মতই আছড়ে পড়বে খুলির ওপর। আর যদি একটা হাতুড়ি ফেলি—খুব ছোট্ট হাতুড়ি হলেও—”

পাঁচিলের ওপর একটা পা তুলে দিলে পিটার স্যালদান্হা। চকিতে কলার চেপে ধরল ফাদার মণ্ডল।

“ও পথে নয়”, বললে কোমল স্বরে—“ও পথ জাহান্নমে গেছে।’

টলমল করে উঠে পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল পিটার; ভয়ার্ত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল খর্বকায় পাদরীর দিকে।

সেকেণ্ড কয়েক পরে বলল অবরুদ্ধ কণ্ঠে—“কি করে জানলেন আপনি? আপনি গণৎকার না শয়তান?”

“আমি মানুষ”, গম্ভীরভাবে জবাব দিল ফাদার মণ্ডল, “কাজেই

শয়তান আমার মনেই আছে। শুনুন", একটু থেমে আবার বলল—"আপনার কোনো কীর্তিই আমার অজানা নয়। অবশ্য সবটাই আমার অনুমান। ভাইকে ছেড়ে গির্জেতে ঢোকার সময়ে আপনার মনের অবস্থাটাও আমার অনুমান। প্রচণ্ড রাগে আপনি অন্ধ হয়ে গেছিলেন। রাগে মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আপনিও সেই অজ্ঞান মুহূর্তে হাতুড়িটা তুলে নিয়েছিলেন, ইচ্ছে ছিল সেইখানেই ভাইয়ের নোংরা মুখটা থেঁতো করে দেওয়ার। কিন্তু ইচ্ছেটা মনে আসতেই শিউরে উঠেছিলেন আপনি—তাড়াতাড়ি গাউন আর বোতাম দেওয়া কোটের নিচে হাতুড়িটা লুকিয়ে নিয়ে একরকম দৌড়েই ঢুকে পড়েছিলেন গির্জের মধ্যে। অশান্ত মনে বেশ কয়েক জায়গায় ঈশ্বরের নাম নিয়ে মনকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন। দেবশিশু-জানলায় গেছিলেন, হয়ত তার ওপরে এই চাতালে এসেছিলেন, এমন কি এরও ওপরের চাতালেও উঠেছিলেন। অত উঁচু থেকে ভাইয়ের টুপী দেখে মনে হয়েছিল যেন একটা সবুজ রঙের গুবরে পোকা ক্লেদাক্ত দেহে গুঁড়ি মেরে রয়েছে। ঠিক তখনি অঘটন ঘটে গেল আপনার আত্মার মধ্যে। ভগবানের বজ্র নেমে গেল আপনার হাত থেকে।"

কাঁপতে কাঁপতে গাল খামচে ধরে প্রশ্ন করল পিটার—"কী করে জানলেন সবুজ টুপীটাকে গুবরে পোকার মত দেখতে লাগছিল?"

পাণ্ডুর হেসে বলল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল—"সেটা কমনসেন্স। সে কথা যাক। আগেই বলেছি, আপনার সব কীর্তিই আমি জানি। কিন্তু আর কেউ জানে না। জানবেও না। এরপর এগুতে হবে আপনাকেই—আমি এগুব না। আমৃত্যু এ রহস্যের ওপর গালামোহর এঁটে দিলাম আমি। যদি বলেন কেন, বলব কারণ অনেক। তার মধ্যে একটা কারণ আপনি জানতে পারেন। এ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে দিচ্ছি এই কারণে যে,

গুপ্তঘাতকরা কুপথে নেমে যতটা গোল্লায় যায়, আপনি এখনও ততটা যাননি। কমল কামারের ঘাড়ে খুনের অপরাধ চাপিয়ে দেওয়া খুব সহজ জেনেও আপনি সে পথ মাড়ান নি। কামার-গিন্নীকেও রেহাই দিয়েছেন—অথচ আপনার মুখের একটা কথাতেই তা সম্ভব ছিল। বেছে নিয়েছেন এমন একটা হাবলাকে যে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে কোর্ট থেকে। আপনার এই মহত্বটুকুই সাধারণ খুনেগুণ্ডা থেকে আপনাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। চলুন, গাঁয়ে ফিরে যাওয়া যাক। কথা দিলাম আপনাকে এ রহস্য আর কেউ জানবে না। বাতাসের মতই স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ান যেদিকে খুশী।"

নীরবে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল দুই মূর্তি। এসে দাঁড়াল কামারশালার উঠোনে। কাঠের ফটকের হুড়কোটা আলতো করে তুলে ধরে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল পিটার স্যালদান্‌হা। বলল, "ইন্সপেক্টর, আমি ধরা দিচ্ছি। টমাসকে আমিই খুন করেছি।"

নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল সবাই। পিটার স্যালদান্‌হার নাটকীয় আত্মসমর্পণের পরেই পাঁজর খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সকলে। মুখ দেখে বোঝা গেল পিটারের ধরা দেওয়াটা কারোরই মনঃপূত হয়নি।

ইন্দ্রনাথ বললে—"কি হলো বৌদি! একেবারেই মুষড়ে পড়লে দেখছি! নেক্সট গল্পের অর্ডারটা হয়ে যাক।"

বিমর্ষমুখে বলল কবিতা—"দূর, মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল।"

টিপ্পনী কাটল ইন্দ্রনাথ—"মুড ভাল করার উপকরণ তো এসে গেছে বৌদি।"

বিশাল থালায় থরে থরে গরম মাছের কচুরী সাজিয়ে ইন্দ্রপত্নী

শচীদেবীর মত প্রবেশ করলেন অনুবৌদি এবং ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল থালা। মুখ মুছতে মুছতে সশব্দে উদ্গার তুললাম। কটমট করে তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কবিতা—“যেমন গেলার ছিরি, তেমনি ঢেকুর তোলার ছিরি। বলি, এবার গপ্প-টপ্প হবে না কি?”

“সম্রাজ্ঞীর হুকুম হলেই হয়।”

“হুকুম হচ্ছে। গল্প শুনে কান্না-টান্না যেন না পায়।”

“বেশ হাসির গল্প হবে। গল্পের নাম…গল্পের নাম…”

“যখন উধাও হলেন মিঃ চোঙ, ধরিয়ে দিল ফাদার ঘনশ্যাম।” “আজ থেকে একবছর আগে এই ম্যাঙ্গালোর থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেছিল মিঃ চোঙ।”

“যো হুকুম।”

দুরন্ত আরব সাগর। তার তীরে ছোট্ট ম্যাঙ্গালোর শহর। সাগরের ধারেই লাইট-হাউস হিল। ডক্টর জগদানন্দ মালাকারের চেম্বার এই লাইট-হাউস হিলেরই ওপরে।

ডক্টর জগদানন্দ মালাকার খ্যাতনামা ক্রিমিনলজিস্ট অর্থাৎ অপরাধ-বিজ্ঞানী। এছাড়া, নৈতিক বিপর্যয়ের ব্যাপারেও তিনি বিশেষজ্ঞ। লম্বা-লম্বা ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়ে সাজানো তাঁর বাড়ি। জানলার মধ্যে দিয়ে আরব সাগরকে মনে হয় যেন নীলচে-সবুজ মার্বেলের অন্তহীন প্রান্তর।

সমুদ্রের এই দুরন্ত ভয়ানক কিন্তু দিব্বি পরিপাটি সৌন্দর্য মালাকারেয় ঘরের সাজ-সজ্জার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ ঘরে কবিতা আছে, বিলাসিতা আছে, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম আছে। একদিকের দেওয়াল ঢাকা পড়ে গেছে দেশ-বিদেশের অগুন্তি কবিতাগ্রন্থে। দুটো জানলার পাশেই বাহারি সিগার-র‍্যাকে সারি সারি রকেটের মত সাজানো রয়েছে গোটা দশেক চুরুট—সব থেকে

ছোটটি বাঁদিকে, সবথেকে বড়টি ডানদিকে। তারও ওদিকে রয়েছে ডিক্যাণ্টার, ব্র্যাণ্ডি, হুইস্কি আর রম। অপরদিকের দেওয়ালের গা ঘেঁষে কেমিস্ট্রি আর যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি তার ইয়ত্তা নেই।

খ্যাতনামা ক্রিমিনলজিস্ট জগদানন্দ মালাকারের চেহারাটিও দেখবার মত। অঙ্গে তাঁর আর্টিস্টের মত ভেলভেটের বসন থাকলেও আর্টিস্ট-সুলভ অগোছালো ভাবটি একেবারেই নেই। দুই চোখে সুগভীর দৃষ্টি থাকলেও তা স্বপ্নালু বেহিসেবী নয়।

এহেন ছিমছাম সাজানো-গোছানো পরিবেশের মধ্যে অতর্কিতে সেদিন প্রবেশ করল নেহাতই বেমানান এক মূর্তি। বেঢপ চালকুমড়োর মত বেঁটে শরীর। উস্কখুস্ক চুল। হাতের ছাতাটি যেমন নোংরা, তেমনি ভাঙা—মেরামতেরও অযোগ্য।

অবাক হয়ে এই কিম্ভূতকিমাকার মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন বিখ্যাত ক্রাইম-স্পেশালিস্ট ডক্টর জগদানন্দ মালাকার। যে ধাতু দিয়ে এঘর আর তার মালিকের সৃষ্টি, এ মূর্তি যেন তা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধাতু দিয়ে তৈরী। ভাঙা ছাতাটা সামলাতে সামলাতে অমায়িক হেসে ঘনশ্যাম মণ্ডল বলল "বিরক্ত করলাম বলে মাপ করবেন। কিন্তু ভূতদের ব্যাপারটা নিয়ে না এসে পারলাম না। শুনেছি এসব ঝামেলায় প্রায়ই আপনার সাহায্য পাওয়া যায়।"

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে শক্ত গলার বললেন মালাকার—"আপনার বোধহয় বাড়ি চিনতে ভুল হয়েছে। আমি ডক্টর মালাকার। আমার সাধনা হল সাহিত্য আর শিক্ষা। অবশ্য মধ্যে মধ্যে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জটিল সমস্যা নিয়ে পুলিশ আমাকে কনসাল্ট করে বটে—"

"এটাও তো দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা" তাড়াতাড়ি বললে বামনমূর্তি। "কিছুতেই যূথিকার মা রাজী হচ্ছে না এ বিয়েতে।"

ভ্রূকুটি আরও ঘন হয়ে উঠল মালাকারের ললাটে। কিন্তু

দুই চোখে যে দীপ্তি দেখা গেল তা কৌতুকের কি ক্রোধের ঠিক ধরা গেল না।

মুখে বললেন মালাকার, “ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

কালো আলখাল্লার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল ঘনশ্যাম মণ্ডল—“জগন্নাথ ভট্ট যূথিকা কিনিকে বিয়ে করতে চাইছে। বলুন দিকি, এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কি আর থাকতে পারে?”

সাহিত্য আর শিক্ষা নিয়ে সাধনার ফলে স্বাস্থ্য এবং আরও কয়েকটি জিনিসকে বিসর্জন দিতে হয়েছে ডক্টর মালাকারকে। কিন্তু হাস্যরস তাঁকে একেবারে ছেড়ে যায়নি। তাই বেঁটে ঘনশ্যামের শিশুর মত সরল আবেদন শুনে প্রাণখোলা অট্টহাস্য করে উঠলেন মালাকার। ধপাস করে একটা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আশ মিটিয়ে হাসলেন।

তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন——“মিঃ মণ্ডল, আজ থেকে ঠিক পনেরো বছর দশ মাস আগে আমারই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে মাথা ঘামাতে হয়েছিল আমাকে। তারপর মাইশোরের মহারাজা আর পুট্টুরের জমিদারের মধ্যস্থতা করতে হয়েছিল এই অধমকেই। আর, আজ আপনার বন্ধু জগদানন্দ ভট্ট যূথিকা কিনির উপযুক্ত বর কিনা, তা ফরসালা করার জন্যে আমার সাহায্য চাইছেন আপনি। আমি স্পোর্টসম্যান। কাজেই আপনার আবেদন গ্রাহ্য করলাম। মাইশোরের মহারাজাকে যেভাবে আমার উপদেশ আমি দিয়েছিলাম, জগন্নাথ ভট্ট আর যূথিকা কিনিকেও সেইভাবেই দেবার চেষ্টা করব। আজ বিকেলে আমার হাতেও বিশেষ কাজ নেই। বলুন আপনার গল্প।”

তৎক্ষণাৎ গল্প শুরু করে দিল ঘনশ্যাম, “আগেই বলেছি আমার নাম ঘনশ্যাম মণ্ডল। পেশায় আমি পাদরী। রোমান ক্যাথোলিক।

হামপনকাট্টা থেকে যে রাস্তাটা সাউথ কানারার দিকে গেছে, তারই একপাশে একটা মাঝারি সাইজের হোটেল নিশ্চয় দেখেছেন। আমি উঠেছি সেইখানেই। হোটেলের কর্ত্রী বিধবা। নাম, মিসেস কিনি। হোটেল মানেই ঝামেলার জায়গা। কিন্তু মিসেস কিনির দাপটে কোনো ঝামেলাই বেশী দূর গড়াতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি একটা ঝামেলা বেশ খানিকটা গড়িয়েছে। জগন্নাথ ভট্ট নামে একজন যুবক কিছুদিন হল ডেরা নিয়েছে হোটেলে। ছেলেটি মিসেস কিনির একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে ?”

“আর মেয়েটি ?” দুই চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর মালাকার।

“ঝামেলা তো সেইখানেই। যূথিকা কিনিও তাকে বিয়ে করবে বলে বেঁকে বসেছে।” উত্তেজিত মুখে বলে ফাদার ঘনশ্যাম।

“তাহলে তো সমস্যা খুবই জটিল হয়ে উঠেছে দেখছি,” মন্তব্য করলেন আপরাধ-বিজ্ঞানী জগদানন্দ।

ফাদার ঘনশ্যাম উৎসাহিত হয়ে বলে চলল—“মিসেস কিনির মতে জগন্নাথ ভট্টর স্বভাব-চরিত্র বিলক্ষণ সন্দেহজনক। সারা দিনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা হোটেলের ঘরেই দরজা বন্ধ করে করে কি যে ছাই করে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। মিসেস কিনি বলেন, জগন্নাথ নিশ্চয় বন্ধ ঘরে বোমা তৈরী করে। আর ওর যত কিছু পয়সা, তা এই বোমা বেচেই।

“আরও রহস্য আছে। প্রায়ই জগন্নাথকে বন্ধ ঘরে আর একজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে শোনা যায়। কিন্তু ঘর খোলা হলেই নাকি জগন্নাথকে ছাড়া ঘরে আর কাউকে দেখা যায় না। জগন্নাথ অবশ্য, বলেছে, এটা কোনো রহস্যই নয়। বিয়ের আগে সব কথাই সে খুলে বলবে।

"আরও আছে। জানেন তো মুখে মুখে এসব গল্প কি রকম পল্লবিত হয়। অদ্ভুত লম্বা একটা লোক নাকি একদিন সন্ধ্যে বেলা সমুদ্রের ফেনার মধ্যে থেকে উঠে এসেছিল—দাঁড়িয়ে ছিল জগন্নাথের জানলার সামনে। জগন্নাথের সঙ্গে তার দারুণ কথা কাটাকাটি হয়েছিল। লোকটার মাথায় নাকি একটা বেজায় লম্বা সিল্কের হ্যাটও ছিল। বাগ-বিতণ্ডার পর জগন্নাথ দারুণ রেগে গিয়ে দড়াম করে জানলা বন্ধ করে দিয়েছিল। লোকটাও লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার নেমে গেছিল বালুকাবেলায়, ধীরে ধীরে যেন গলে মিলিয়ে গেছিল কুয়াশার মধ্যে।

"এ গল্পটা অবশ্য হোটেলের অন্যান্য চাকর চাকরাণীর মুখে শোনা। তবে মিসেস কিনি এসব বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে ঢ্যাঙা আগন্তুক প্রতিদিন জগন্নাথেরই ঘরের কোণে রাখা মস্ত সিন্দুকের মত কাঠের বাক্স থেকে বেরিয়ে আসে—জগন্নাথের সঙ্গে কথা বলে আবার কাঠের বাক্সর মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায়। বাক্সটায় কিন্তু অষ্টপ্রহর তালা ঝোলানো থাকে।

"কাজেই, বুঝতেই পারছেন কি পরিমাণ রহস্য জমে উঠেছে জগন্নাথ ভট্টকে ঘিরে। অথচ জগন্নাথকে দেখে সেরকম মোটেই মনে হয় না। দিব্বি হাসি-খুশী। হোটেলের টাকা-পয়সাও নিয়ম মত সে মিটিয়ে দিচ্ছে। ছেলেপুলেরা সবাই তাকে ভালবাসে। শেষপর্যন্ত যূথিকা কিনিও তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে।"

তন্ময় হয়ে শুনছিলেন ডক্টর মালাকার। ফাদার মণ্ডল থামতেই একটা মাঝারি সাইজের চুরুট এগিয়ে দিয়ে নিজে আর একটি ধরিয়ে নিলেন। তারপর আয়েশ করে আর্মচেয়ারে টান-টান হয়ে শুয়ে বললেন—"মেয়েরা সব দেশেই সমান। পৃথিবী যতই উন্নত হোক, বৈজ্ঞানিক প্রগতি মানুষকে যতই ওপরে তুলুক, মেয়েরা তাদের কুসংস্কারকে কোনোদিনই ছাড়বে না। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা নিয়ে আমরা যখন অ্যামিবার মধ্যে বিশ্বরহস্যের সূত্র অন্বেষণ করি,

তারা তখন ফ্যানটাসি কল্পনায় মশগুল থাকতেই ভালবাসে। সমুদ্র থেকে প্রেত উঠে আসার যে চিত্তাকর্ষক কাহিনী আপনি শোনালেন তার—”

জগদানন্দ মালাকারের লেকচার অন্তে পৌঁছোনোর আগেই ধূমকেতুর মত ঘরে প্রবেশ করল একজন তরুণী। সাগরের পাগলা হাওয়ায় উস্কখুস্ক তার সোনালী চুল। চাবুকের মত সতেজ শরীর। বেশ-ভূষা বাহুল্যবর্জিত, উগ্র। গালের হনু দুটি উঁচু না হলে অনায়াসেই তাকে নিখুঁত সুন্দরী বলা যেত।

উত্তেজনায় আরক্ত মুখে বললে মেয়েটি, “দুঃখিত। কিন্তু ফাদার মণ্ডলের সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলা দরকার আমার। সমস্যাটা জীবন-মরণের।”

আলুথালু ভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে শুধোলো ফাদার ঘনশ্যাম—“ব্যাপার কি যূথিকা?”

হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে বলল যূথিকা—“জগন্নাথ বোধহয় খুন হয়েছে। চোঙ নামে সেই লোকটা আবার এসেছিল। বন্ধ দরজার এপাশ থেকে পষ্ট কথা বলতে শুনেছি ওদের। জগন্নাথ নিচু গলায় কথা বলছিল। কিন্তু লোকটা বেশ চড়া গলায় হুমকি দিচ্ছিল।”

“চোঙ নামে সেই লোকটা—তার মানে?” একটু যেন ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চায় ফাদার ঘনশ্যাম।

“হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওর নাম চোঙ,” অধীরভাবে মাটিতে পা ঠুকে বলল যূথিকা। “দরজা বন্ধ থাকলেও সব শুনেছি আমি। ঝগড়া করছিল দুজনে। টাকা নিয়ে ঝগড়া বলেই মনে হল। কেননা, জগন্নাথ বার বার বলছিল, ‘ঠিক আছে, মিঃ চোঙ’ অথবা ‘না-না মিঃ চোঙ’, আবার তারপরেই, ‘দুই আর তিন, মিঃ চোঙ।’ কিন্তু বেশী কথা বলে সময়ই নষ্ট হচ্ছে। এক্ষুনি আসুন—আর দেরী করা যায় না।”

"কেন দেরী করা যায় না?" তীক্ষ্ণ চোখে তরুণী যূথিকাকে দেখতে দেখতে বললেন জগদানন্দ মালাকার। "চোঙ আর তার টাকা কি এতই জরুরি যে এক্ষুনি না গেলেই নয়?"

যূথিকা বললে—"দরজা ভাঙ্গতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। তাই পেছনে উঠোনে গিয়ে কোনমতে জানলার চৌকাঠে উঠে ভেতরে তাকিয়ে প্রথমে অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখলাম না। মনে হল ঘর খালি। তারপরেই দেখলাম, পুঁটলির মত এককোণে পড়ে রয়েছে জগন্নাথ। মরে গেছে কি অজ্ঞান হয়ে গেছে, ধরতে পারলাম না।"

"সিরিয়াস ব্যাপার," ছাতাটা নিয়ে উঠতে উঠতে বলল ফাদার ঘনশ্যাম। "আমি কিন্তু তোমার ব্যাপারটাই এঁর কাছে বলছিলাম। ওঁর মতামত—"

"এখন অনেক পাল্টে গেছে," গুরু-গম্ভীর গলায় বললেন বৈজ্ঞানিক। "ভদ্রমহিলাকে যতটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভেবেছিলাম, দেখছি ততটা নন। এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই হ্যামপনকট্টার দিকে রওনা হল তিন-মূর্তি। পথেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। মিসেস কিনির হোটেলে পৌঁছোতেই কাংস্যকণ্ঠে জগন্নাথ ভট্টের আত্মশ্রাদ্ধ শুরু করে দিলেন বিধবা ভদ্রমহিলা। যূথিকা কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে বামন ঘনশ্যাম আর শীর্ণ জগদানন্দকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল একতলার একটি ঘরের সামনে। দরজা বন্ধ ছিল। জগদানন্দ মালাকার পাকা গোয়েন্দার মতই প্যানেলে কাঁধের ধাক্কা মেরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ঢুকেই দেখা গেল এক লণ্ডভণ্ড দৃশ্য। এক নজরেই বোঝা যায় একাধিক পুরুষের একটা নাটকীয় সংঘাত ঘটে গেছে। টেবিল আর মেঝের ওপর এলোমেলাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তাস আর তাস —যেন হঠাৎ খেলায় বাধা দিয়েছে কেউ। ওপাশের ছোট্ট একটা

টেবিলের ওপর রয়েছে দুটো কাঁচের সিলিণ্ডারের মত হাল্‌ফ্যাশানি মদের গেলাস—আর একটা মেঝের ওপর পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। তার কয়েক ফুট দূরেই চকচক করছে একটা লম্বা-ফলা ছোরা—হাতলে ভারী সুন্দর কারুকাজ। ওপাশের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাগানের কালো গাছ—তারও ওদিকে সমুদ্র, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে যা আলকাতরার সমুদ্রের মতই দেখাচ্ছে। ঘরের অপর কোণে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা সিল্কের লম্বা হ্যাট—যেন ঘুষি খেয়ে আচমকা ঠিকরে পড়েছে মাথা থেকে। এদিকের কোণে আলুর বস্তার মত আষ্টেপৃষ্টে দড়ি বাঁধা অবস্থায় তালগোল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে শ্রীমান জগন্নাথ ভট্ট। মুখে একটা বড় রুমাল বাঁধা। কনুই আর গোড়ালির ওপর দিয়ে বেশ করে পেঁচিয়ে বাঁধা-গোটা ছ-সাত দড়ির গাঁট। দুই চোখ অত্যন্ত চঞ্চল আর পিচ্ছিল।

মুহূর্তের জন্যে দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে নীরবে সমস্ত দৃশ্যটা যেন মনের পটে এঁকে নিলেন বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ। তারপর ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে তুলে নিলেন সিল্কের লম্বা হ্যাটটা; গম্ভীর মুখে বসিয়ে দিলেন হাত পা বদ্ধ জগন্নাথের মাথায়। মস্ত টুপী। কাজেই জগন্নাথের মুখ তো অদৃশ্য হলোই, টুপী গিয়ে ঠেকলো কাঁধে।

"মিঃ চোঙের হ্যাট," টুপীটা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন ডক্টর মালাকার। পকেট থেকে একটা আতশ কাঁচ বার করে ভেতরটা দেখতে দেখতে বললেন—"মিঃ চোঙ নেই অথচ মিঃ চোঙের টুপী রয়েছে—এ রহস্যের একটা কিনারা হওয়া দরকার। তার আগে বলে নিই, মিঃ চোঙ জামা-কাপড়ে খুবই সৌখীন পুরুষ। হ্যাটটার স্টাইলই দেখবার মত। তাছাড়া নিয়মিত বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করা আর মাঝে মাঝে বার্নিশ করতেও ভোলেননি মিঃ চোঙ। টুপীটা অবশ্য নতুন নয়। পুরোনো।"

"কী বিপদ !" বললে মিস কিনি। "জগন্নাথের বাঁধন আগে খুলবেন তো !"

"পুরোনো বললাম বটে তবে খুব জোর দিয়ে বলিনি", বললেন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ "কারণটা খোলসা করেই বলছি। মানুষের চুল কারও সমানভাবে পড়ে না। কম-বেশী মাত্রায় পড়ে। কিন্তু একটু-আধটু প্রত্যেকেরই পড়ে। কাজেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সদ্য মাথায় দেওয়া যে কোনো টুপীতে চুল দেখতে পাওয়া উচিত। কিন্তু এ টুপীতে আমি তেমন কিছুই দেখছি না। কোনো চুলই নেই এখানে। তাই থেকেই আমি অনুমান করতে বাধ্য হচ্ছি—যে মিঃ চোঙের মাথায় বিরাট টাক আছে। এর সঙ্গে যদি আমরা মিঃ চোঙের চড়া গলায় হুমকি দেওয়ার অভ্যেস জুড়ে দিই—মিস কিনির মুখেই একটু আগে আমরা তা শুনেছি—(ধৈর্য ধরুন মিস কিনি, ধৈর্য ধরুন) তাহলে চুলহীন মাথা আর রাগীলোকের চ্যাচানি মিলিয়ে পাচ্ছি এমন একটি লোক যার বয়স হয়েছে। সাধারণত মানুষের বয়স হলেই চুল উঠে যায়, আর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। মিঃ চোঙ বদমেজাজীও বটে বেশ ঢ্যাঙা তো নিশ্চয়। জানলার ধারে লম্বা টুপী পরে তালঢ্যাঙা মিঃ চোঙকে যারা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে তাদের কথা তো বিশ্বাস করছিই—উপরন্তু আর একটা প্রমাণ আমি হাজির করছি। এই যে কাঁচের সিলিণ্ডারটা ঘরময় ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে, তার একটা টুকরো দেওয়ালের ব্র্যাকেটেও দেখতে পাচ্ছি। জগন্নাথবাবু বেঁটে মানুষ—তাঁর হাতে কাঁচের টুকরো ওখানে পৌছবে না, পৌঁচেছে মিঃ চোঙের হাতে—যিনি নিঃসন্দেহে বেজায় লম্বা পুরুষ।"

"একটা কথা বলে নিই," বলল ঘনশ্যাম মণ্ডল, "জগন্নাথবাবুর হাত-পায়ের দড়িগুলো এবার খুলে দিলে ভাল হত না ?"

"ভাঙ্গা পানপাত্র থেকে আরও অনেক জানবার আছে," আবার শুরু করলেন বিজ্ঞানী জগদানন্দ। "একথা আমি অনায়াসেই বলতে

পারি যে মিঃ চোঙের মাথায় টাক পড়াটা অথবা মেজাজ খিটখিটে হওয়াটা শুধু বয়েসের জন্যেই হয়নি। হয়েছে স্নায়ুর ওপর অত্যধিক অত্যাচারের জন্যে। জগন্নাথ ভট্টর সম্বন্ধে যা শুনেছি, তা থেকে আমরা জেনেছি—তিনি সুরাপান করেন না। অমন শান্তশিষ্ট অমায়িক লোকের পক্ষে মদে আসক্তি সম্ভব নয়। কাজেই এই তাস আর মদের গেলাস তার দৈনিক অভ্যাসের ফর্দে নেই—এ জিনিস বেরিয়েছে কোনো বিশেষ সঙ্গীর জন্যেই। আরও আছে। মদের গেলাস আছে বটে কিন্তু মদ নেই ঘরের কোথাও। নিশ্চয় ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কি ঢালা হয়েছিল এ গেলাসে। মিঃ চোঙই পকেট-ফ্ল্যাস্কে করে নিয়ে এসেছিলেন নেশার জিনিস। তাহলে লোকটার চেহারায় মোটামুটি একটা বর্ণনা আমরা পাচ্ছি : ঢ্যাঙা, বয়স্ক সৌখীন, কিন্তু বদমেজাজী, তাস আর মদের ভক্ত। নাম শুনে মনে হয়, নিশ্চয় সে চীনেম্যান। মিঃ চোঙের মত দুর্বৃত্তদের সমাজের সব মহলেই দেখতে পাওয়া যায়।”

এবার চিলের মত চেঁচিয়ে বললে যূথিকা—“আমাকে যদি ঘরে ঢুকতে না দেন, জগন্নাথের হাত-পায়ের বাঁধন খুলতে না দেন, তাহলে বাইরে গিয়ে চ্যাঁচামেচি করে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব আমি।”

“আমার উপদেশ যদি নেন মিস কিনি, ভুলেও সে কাজটি করতে যাবেন না,” দারুণ গম্ভীর গলায় বললেন ডক্টর মালাকার। “পুলিশের জন্যে হাঁকপাঁক করেছেন কি মরেছেন। ফাদার মণ্ডল, সিরিয়াসলি বলছি, এঁদের সামলান। আমার জন্যে নয়, ওঁদেরই জন্যে। আচ্ছা মিঃ চোঙের চেহারা আর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনলেন এতক্ষণ। কিন্তু জগন্নাথবাবু সম্বন্ধে বেশী কিছু জেনেছেন কি ? মিঃ ভট্ট সম্বন্ধে যা জানা গেছে তা মোটামুটি তিন ভাগ করা যায়। প্রথম উনি মিতব্যয়ী ; দ্বিতীয়, ওঁর পয়সাকড়ি আছে ; তৃতীয়, ওঁর একটা গোপন রহস্য আছে। আপনারা জানেন

ব্ল্যাকমেলিং হয় এই তিনটি কারণেই। কাজেই মিঃ চোঙ এক্ষেত্রে ব্ল্যাকমেলার ঃ আর মিঃ ভট্ট তাঁর শিকার। ফলে, যা হবার তাই হয়েছে। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে আজ কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি, শেষ পর্যন্ত হাত ছেড়ে হাতিয়ার নিয়ে মারামারিও হয়েছে।”

“দড়িগুলো আপনি খুলবেন কিনা”—একগুঁয়ে স্বরে জানতে চাইল যূথিকা কিনি।

সন্তর্পণে সিল্কের হ্যাটটা ছোট টেবিলের ওপর রেখে ডক্টর মালাকার জগন্নাথ ভট্টের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে ঘাড় ধরে একটু ঘুরিয়ে দিলেন অসহায় ভট্টকে।

তারপর বললেন—“ঠিকই আছে। পুলিশ এসে হাতকড়ি না লাগানো পর্যন্ত এই দড়িতেই কাজ চলে যাবে।”

নির্বোধের মত এতক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল ফাদার মণ্ডল। এবার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল—“কি বলতে চান আপনি ?”

বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ লম্বা ফলাওলা বিচিত্র ছোরাটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন “জগন্নাথবাবুকে দড়ি বাঁধা অবস্থা দেখেই আপনারা সবাই একযোগে ভেবে নিয়েছেন দড়ি বেঁধেছে মিঃ চোঙ। তারপর সটকান দিয়েছে। কেমন, তাইতো ? কিন্তু এ ধারণায় আমার সবশুদ্ধ চারটে আপত্তি আছে প্রথম, মিঃ চোঙের মত বেশভূষায় পরিপাটি এমন সৌখীন মানুষ স্বইচ্ছাতেই যদি এখান থেকে সরে পড়েন, তবে টুপীটা রেখে গেলেন কেন শুনি ? দ্বিতীয়,” বলে জানলার সামনে এগিয়ে গেলেন জগদানন্দ, “সবার চোখে ধুলো দিয়ে ঘর থেকে লম্বা দেওয়ার এই একটি মাত্র পথ ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া। সার্সি-পাল্লার কোনো কাঁচও ভাঙ্গা নেই। তৃতীয়, ছোরাটার ফলায় এক কণা রক্ত লেগে রয়েছে বটে, কিন্তু জগন্নাথবাবুর গায়ে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। মরা অথবা জ্যান্ত অবস্থায় অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে মিঃ চোঙই অদৃশ্য হয়েছেন। এবার এই তিন সূত্রর সঙ্গে একটি মাত্র প্রাথমিক সূত্র

যোগ করলেই পুরো গল্পটা আপনারা পাচ্ছেন। সোনার ডিম যে পাড়ে, সেই হাঁসকে যেমন কেউ মারতে চায় না, তেমনি ব্ল্যাকমেলারও কখনো তার শিকারকে হত্যা করে না, শিকারই ব্ল্যাকমেলারকে খতম করে। ব্যাস, এ গল্পে আর কোনো রহস্য রইল না।”

“কিন্তু দড়িগুলো?” সপ্রশংস বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করল ফাদার ঘনশ্যাম।

“ঠিক। এবার এই দড়িগুলোর ধাঁধার সমাধান করা যাক,” অসাধারণ দৃপ্তকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন সুবিখ্যাত স্পেশালিষ্ট। “মিস কিনি বার বার জানতে চাইছেন, কেন আমি এতক্ষণ দড়িদড়া খুলে মুক্তি দিইনি মিঃ ভট্টকে। উত্তরটা এখন দিচ্ছি। দড়ি খুলে মুক্তি দিইনি এই কারণে যে যখন খুশী মিঃ ভট্ট ইচ্ছে করলেই নিজে থেকেই দড়ি খুলে মুক্ত হতে পারবেন বলে।”

“কী?” নিঃসীম বিস্ময়ে যেন ফেটে পড়ল উপস্থিত শ্রোতারা।

“মিঃ ভট্টর দড়ির গাঁটগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি,” শান্ত কণ্ঠে বললেন জগদানন্দ। “আপনাদের পাঁচজনের শুভেচ্ছায় গাঁট কত রকমের হয় সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে—জিনিসটা অপরাধ-বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে বলেই এ জ্ঞান এসেছে। যে কটা গাঁট আপনারা দেখছেন, তার প্রতিটি উনি নিজেই বেঁধেছেন, এবং দরকার হলে নিজেই খুলতে পারবেন। এমন কোনো গাঁট আমি দেখছি না যা ওঁর শত্রুর পক্ষে বাঁধা সম্ভব। দড়ি বাঁধার পুরো ব্যাপারটাই দারুণ ধড়িবাজি ছাড়া কিছুই নয়, স্রেফ ধাপ্পাবাজি। মিঃ চোঙই যে মিঃ ভট্টকে হাত-পা বেঁধে ফেলে গেছে—এই ধারণাটাকেই আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। পেছনের বাগানেই হয়ত পুঁতে রাখা হয়েছে মিঃ চোঙের লাশ।”

থমথমে স্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে। নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে কথা বলার মত সাহস হারিয়ে ফেলে সবাই। কাঁচের জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে কালো সমুদ্র—যার গর্ভ থেকে উঠে এসেছিল ভয়ংকর অক্টোপাশের মতই রহস্যময় মিঃ চোঙ—ঘটনাচক্রে সেই অলৌকিক সাগর-দানোকেই পৃথিবীর মানুষের হাতে প্রাণবিসর্জন দিয়ে চিরনিদ্রায় শুতে হয়েছে ধরিত্রীর কোলে।

এ যেন এক বিচিত্র গোলকধাঁধা ; রহস্যের মধ্যে রহস্য।

ক্ষুদে পাদরী ঘনশ্যাম মণ্ডলের মুখে এতক্ষণ হাস্যকর নির্বুদ্ধিই প্রকাশ পাচ্ছিল। অকস্মাৎ অদ্ভুত ভ্রূকুটিতে গ্রন্থিল হয়ে উঠল তার ললাট। এতক্ষণ যা নিরীহ ছিল, এখন হয়ে উঠল তা চিন্তাকুটিল। শূন্য কৌতূহলের জায়গায় ভেসে উঠল নিঃসীম ঔৎসুক্য।

“সর্বনাশ, আপনি বলছেন, জগন্নাথ ভট্ট নিজেই নিজেকে বেঁধেছে, আবার নিজেই নিজেকে খুলতে পারে ?” আশ্চর্য রোশনাই জ্বলে ওঠে ফাদারের কুতকুতে চোখে।

“হ্যাঁ, আমি তাই বলছি,” বললেন জগদানন্দ মালাকার।

“মাই গড ! কিন্তু তাও কি সম্ভব ?”

বলে, যেন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে ফাদার ঘনশ্যাম। খরগোশের মত দ্রুত বেগে ঘুর ঘুর করতে থাকে ঘরময়। তারপর এসে দাঁড়ায় বন্দীর সামনে। রুমাল দিয়ে আধখানা ঢাকা মুখের দিকে যেন নতুন চোখে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

অবশেষে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—“যা ভেবেছি, তাই ! মুখ দেখেও কি ছাই কিছু বুঝছেন না ? আরে মশাই, লোকটার চোখ দুটোই দেখুন না কেন !” উত্তেজনায় রণরনিয়ে ওঠে ঘনশ্যামের কণ্ঠ।

প্রফেসার আর যূথিকা দুজনেই যুগপৎ তাকালে জগন্নাথের চোখের দিকে। রুমালের নিচে নাক-মুখ অদৃশ্য থাকলেও মুখের

ওপরের অংশে কিসের যেন একটা লড়াই চলছে বলে মনে হল তাঁদের।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে যূথিকা—"অদ্ভুত! অদ্ভুত! এরকমভাবে জগন্নাথ কোনোদিন তাকায় না! আপনারা জানোয়ার না মানুষ! যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না বেচারীর—আর আপনারা কিনা—"

"উহুঁ, আমার তা মনে হয় না," বললেন ডক্টর মালাকার। "ভদ্রলোকের দুই চোখের ভাষা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক কিন্তু আমার মনে হয়, চোখের কোণে ঐ যে রেখাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে—তা মানসিক বিকৃতির—"

"ও মাই লর্ড!" অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে ঘনশ্যাম—"জগন্নাথবাবু যে হাসছেন, তাও কি বলে দিতে হবে আমাকে?"

"হাসছেন!" সচমকে বললেন জগদানন্দ "হাসতে যাবেন কেন?"

"হাসছেন আপনার কথা শুনে," আমতা আমতা করে বলে পাদরী ঘনশ্যাম। "সত্যি কথা বলতে কি, আমারও একটু হাসতে সাধ যাচ্ছে। কেন জানেন? এতক্ষণে আমি আসল জিনিসটা জানতে পারলাম বলে।"

"এতক্ষণে কোন আসল জিনিসটা জানতে পারলেন, তা জানতে পারি কি?" হঠাৎ ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইলেন জগদানন্দ মালাকার।

"জানতে পারলাম জগন্নাথবাবুর পেশা কি।"

বলে, আর একবার বাঁইবাঁই করে ঘরময় চক্কর দিয়ে নিয়ে ভুঁড়ি নাচিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল ঘনশ্যাম। হাসতে-হাসতে লম্বা টুপীর সামনে থেকে এসে দাঁড়াল ভাঙা কাঁচের সামনে, সেখানেও হাসি থামল না, এল ছোরাটার পাশে। শেষকালে যখন চোখের কোণে জল এসে গেল, তখন অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিমূঢ় দর্শকের দিকে।

বললে সোৎসাহে—"ডক্টর মালাকার। সত্যিই আপনি বিরাট কবি! স্রেফ শূন্য থেকে আপনি এমন একটা জীব সৃষ্টি করেছেন, যার কোন অস্তিত্বই নেই।"

"তার মানে?" উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ। "আমার প্রমাণে ফাঁকি নেই। যুক্তি আমার অকাট্য। মিঃ চোঙ যখন উধাও হয়েছে—"

"এই কথাটাই বলতে চাই আমি," যেন লাফিয়ে উঠল ক্ষুদে পুরুত। "মোদ্দা কথাটাই তো হল এই—মিঃ চোঙ যখন উধাও হয়েছে। ভদ্রলোক এমন নিদারুণভাবে উধাও হয়েছে যে আমার মতে এরকমভাবে এর আগে আর কেউই উধাও হতে পারে নি।"

"আপনি কি বলতে চান ভদ্রলোক শহর থেকেই উধাও হয়েছে?" সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন জগদানন্দবাবু।

"আমি বলতে চাই ভদ্রলোক সব জায়গা থেকেই উধাও হয়েছে। বলতে চাই সব বস্তুর মধ্যে থেকেই উধাও হয়েছে।"

"আপনি কি বলতে চান এ নামে কোন লোকই নেই?" তেঁতোভাবে হেসে বললেন জগদানন্দ মালাকার।

"এগজ্যাক্টলি তাই বলতে চাই। অন্তত দুঃখের সঙ্গেই বলতে চাই।"

এবার হাসবার পালা বৈজ্ঞানিকের। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—"তাই যদি হয় তো একশো একটা প্রমাণ দেখানোর আগে প্রথম প্রমাণটাই হাজির করা যাক। মিঃ চোঙ যদি নাই থাকে, তবে এ টুপী কার?"

"জগন্নাথবাবুর।"

"কিন্তু এ টুপী তাঁর মাথার চাইতে বড়। কাজেই টুপী তিনি কস্মিনকালেও পরেন নি।"

"আমি তো বলিনি যে উনি পরেছেন?" হঠাৎ খুব শান্ত গলায়

বলল ঘনশ্যাম। "আমি শুধু বলেছি, টুপীটা তাঁর। আমি আবার বলছি, টুপীটা তাঁরই।"

ঘৃণায় নাক কুঁচকে কোণঠাসা বেড়ালের মতই ফ্যাস করে উঠলেন বিখ্যাত ক্রিমিনলজিস্ট—"এটা কি মস্করা হচ্ছে ?"

"মোটেই না, মোটেই না," এই প্রথম অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখা গেল ফাদার ঘনশ্যামকে। "দয়া করে যদি সামনের রাস্তা ধরে নেমে গিয়ে ডানদিকে মোড় নেন, তাহলেই একটা টুপীর দোকান দেখতে পাবেন। দোকানে হরেক রকম দিশি-বিলিতি টুপীর মধ্যে এ টুপীও চোখে পড়বে আপনার। আসবার সময়েই শোকেসে একটা আমি দেখে এসেছি।"

"অর্থাৎ বলতে চান, টুপীটা সেই দোকান থেকে কিনে এনেছেন জগন্নাথ ভট্ট। কিন্তু যে টুপী তাঁর মাথার চাইতে বড়, সে টুপী উনি গাঁটের কড়ি খরচ করে কিনতে যাবেন কেন ?"

"খরগোশ বার করবেন বলে।"

"কী !"

"টুপীর মধ্যে থেকে খরগোশ বার করবেন বলে। শুধু খরগোশ কেন, লাল-নীল ফিতে, কেক, লাল মাছ, রঙীন রুমাল, হাঁস, পায়রা—সব কিছুই," তুফান মেলের মত বেগে বলে চলে ফাদার ঘনশ্যাম। "নকল গাঁটগুলো দেখেই কি তা বোঝা উচিত ছিল না আপনার ? ছোরাটার সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। আপনি বলবেন, জগন্নাথের গায়ে আঁচড়ের কোন দাগই নেই। আমি বলব আছে, তবে ওপরে নয়, ভেতরে।"

"আপনি কি বলতে চান জামা-কাপড়ের ভেতরে ?" যূথিকার বিধবা মা এতক্ষণ বাদে কাঁসি বাজান কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

"জামা-কাপড়ের ভেতরে নয়, জগন্নাথবাবুর ভেতরে।"

"তার মানেটা কি আমি জানতে চাই," মুখিয়ে ওঠেন শ্রীমতী কিনি।

প্রসন্ন স্বরে বলল ফাদার ঘনশ্যাম—"জগন্নাথবাবু পেশাদার বাজিকর হওয়ার সাধনা করছেন। শুধু বাজিকর নয়, জাগলার, ভেনট্রিলোকুইস্ট আর দড়ির খেলায় ওস্তাদ হবার সাধনাও চলছে একই সঙ্গে। ঐন্দ্রজালিক হওয়ার জন্যেই প্র্যাকটিশ করছেন বলেই লম্বা এই টুপীটা এসেছে এ ঘরে। টুপীর মধ্যে চুলের চিহ্ন নেই, তার কারণ মিঃ চোঙের টাকে চুল নেই বলে নয়, এ টুপী কোন কালেই কেউ মাথায় দেয় নি বলে। জাগলিং প্র্যাকটিশ করছেন বলেই কাঁচের সিলিণ্ডার তিনটে এসেছেন। শূন্যে লোফালুফির বিদ্যেটা অভ্যেস করেছিলেন উনি, কায়দাটা শক্ত। এখনও পুরোপুরি রপ্ত করে উঠতে পারেন নি, তাই কড়িকাঠে লেগে একটা চুরমার হয়ে গেছে। একটা টুকরো গিয়ে আটকেছে দেওয়ালের ব্র্যাকেটে। ছোরাটা নিয়েও জাগলিং প্র্যাকটিশ করছিলেন জগন্নাথবাবু। লোফালুফি করতে করতে শূন্য পথে ছোরাটাকে গলার মধ্যে দিয়ে লুফে নেওয়ার কৌশল মারাত্মক বটে, কিন্তু সব চাইতে বেশী বাহবা পাওয়া যায় এই খেলাতেই। সাধনায় এখনও পুরোপুরি সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি জগন্নাথবাবু, তাই বেকায়দায় লেগে গলার মধ্যে সামান্য কেটে যায়—তারই দু-এক ফোঁটা রক্ত লেগেছে ফলাটায়। মুখ দেখেই বুঝছি, ক্ষতটা গুরুতর নয়। দড়িবাঁধা অবস্থায় নিজেকে মুক্ত করে আনার কায়দাটাও প্র্যাকটিশ করছিলেন উনি। কিন্তু মুক্ত হওয়ার আগেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমরা। তাসগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ার কারণই হল, চারদিকে তাস ছুড়ে ব্যুমেরাং খেলা অভ্যেস করছিলেন। প্রত্যেক পেশাতেই কিছু না কিছু মন্ত্রগুপ্তি থাকে যা কেউ কাউকে বলে না। জগন্নাথবাবুও এ নিয়ে ঢোল পেটান পছন্দ করেন নি। কিন্তু মেয়েরা স্বভাবতই তিলকে তাল বানায়। বিশেষ করে যাকে দেখতে নারি, তার চলন ভারী। কাজেই নিরীহ মানুষটাকে ঘিরে এত কুৎসার সৃষ্টি। এমন কি মিঃ চোঙ নামে একজন প্রেতমূর্তিরও সৃষ্টি হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমি নিজে যে তু-তুটে গলা শুনেছি, তার বেলা কি বলবেন ?" নাছোড়বান্দার মত জিজ্ঞেস করে যূথিকা।

"ভেনট্রিলোকুইস্টের খেলা কি কোনদিন দেখ নি যদি দেখতে, তাহলে নিজের কানেই শুনতে, প্রথমে স্বাভাবিক গলায় একটা প্রশ্ন করে ভেনট্রিলোকুইস্ট। তারপর চড়া বিকৃত স্বরে মুখ বন্ধ করে উত্তর দেয় গলার মধ্যে থেকে। মনে হয় যেন শূন্য থেকে ভূতে কথা বলছে। মিঃ চোঙের গলা রীতিমত চড়া ছিল, তাই নয় কি ?"

বেশ কিছুক্ষণ অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে অপলক চোখে ফাদার ঘনশ্যামের বোকাবোকা চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলেন বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ। ঘরের নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে তিনিই প্রথম বললেন—"দেখে মনে হয় না আপনি এত সেয়ানা। শুনে মনে হল যেন লোমহর্ষক ডিটেকটিভ গল্প শুনছি কিন্তু একটা জিনিস আপনি একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। মিস কিনি মিঃ চোঙের নাম শুনেছেন জগন্নাথবাবুর গলায়। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন জানতে পারলে বাধিত হব !"

শিশুর মত খিলখিল করে হেসে উঠল রেভারেণ্ড মিঃ ঘনশ্যাম মণ্ডল। বলল—"এই মজাদার কাহিনীর এইটাই হল সব চাইতে মজাদার অংশ। জাগলিং প্র্যাকটিশ করার সময়ে একটার পর একটা কাঁচের সিলিণ্ডার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে পরপর লুফে নিচ্ছিলেন জগন্নাথবাবু। সঙ্গে সঙ্গে গুনছিলেন জোর গলায়—হাত ফস্কে নিচে রাখা কার্পেটে পড়ে গেলেও তা বলছিলেন। উনি আসলে যা বলছিলেন তা এই : এক, তুই, তিন—একটা চোঙা ফস্কাল ; এক তুই—একটা চোঙা ফস্কাল, এইভাবেই চলছিল তাঁর সাধনা।"

আবার থমথমে স্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে। তারপরেই একই সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রত্যেকেই হেসে উঠল হো-হো করে। সেই অবসরে কোণে পুঁটলির মত পড়ে থাকা জগন্নাথ ভট্ট হাত-পায়ের

বাঁধন অক্লেশে খুলে উঠে দাঁড়ালেন। এক টানে মুখ থেকে রুমালটা সরিয়ে নিয়ে ঘরের মাঝে এসে বাতাসে মাথা ঠুকে সার্কাসী কায়দায় অভিবাদন জানালেন সব্বাইকে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পকেট থেকে একটা রঙচঙে হ্যাণ্ডবিল বার করে এগিয়ে ধরলেন সামনে। হ্যাণ্ডবিলে লাল আর কালো কালিতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা ছিল—পৃথিবী সেরা যাদুকর আলাদীন ভট্টের আবির্ভাব বৃত্তান্ত। আগামী পনেরোই তারিখে ম্যাঙ্গালোরের প্রথম শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চ ফালনীর থিয়েটারে দেখা দিচ্ছেন কুশলী বাজিকর, জাগলার, ভেনট্রিলোকুইস্ট আর 'এক্সপার্ট ইন ইণ্ডিয়ান রোপট্রিক' আলাদীন ভট্ট সন্ধ্যে ঠিক সাতটার সময়ে।

শেষ হল মিঃ চোঙের অন্তর্ধান রহস্য। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল কবিতা আর অনুবৌদি।

ভাঙা ছাতাটা সন্তর্পণে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে বলল ফাদার ঘনশ্যাম—"আজ চলি। অনেক রাত হল।"

"কাল আসা চাই।" বললে কবিতা।

পরের দিন বৈকালিক আসর জমজমাট। কচুরি, নিমকি, মুড়ি সহযোগে ধূমায়িত কফি—অহো! অপূর্ব! অপূর্ব!

ফাদার মণ্ডল আগে থেকেই হাজির ছিল। হাজির ছিল কয়েকজন প্রতিবেশী। ফরমাশ হল। বাংলা দেশে ফাদার মণ্ডলের বিচিত্র কীর্তিকলাপের কিছু কিছু শোনাতে হবে আমাকে।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম ফাদারের দিকে।

লোক দেখলেই মধ্যে মধ্যে ঘনশ্যাম পাদরীর মুখে কথা সরে না। মিন মিন করে বললে কোন মতে—"বেয়াড়া আকার।"

শুরু হল সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী।···

কলকাতা শহরের ঘিঞ্জি এলাকা ছাড়িয়ে শহরতলীতে পড়লেই আর চোখ ফেরানো যায় না। বাহারি বাড়ির যেন মেলা শুরু হয়েছে শহরের উপকণ্ঠ থেকে। হরেকরকম গড়নের বিচিত্র সৌন্দর্যের চোখজুড়োনো রঙের বাড়ি বানানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে বিত্তবানেরা। রশ্মিরেখার মত নগরী থেকে বিচ্ছুরিত সড়কগুলোর যে কোনো একটা ধরে খানিকদূর অগ্রসর হলেই দেখা যাবে এই দৃশ্য। কোথাও কেয়ারীকরা বাগানের মাঝে হাল্কা রঙে আঁকা ছবির মত ঝকঝকে তকতকে প্রাসাদ। তার পরেই খানিকটা আবাদী জমি। আরও কিছু দূর গিয়েই হয়ত রাস্তার এপাশে আর একটি নিঃসঙ্গ ভবন—দুদিকে আধ মাইলটাক সবুজ মাঠ। বাড়ি তো নয়, যেন প্রকৃতির শ্যামল মুখের টুকরো টুকরো হাসি।

উত্তরাঞ্চলের এমনি একটি রাস্তা ধরে শহর ছেড়ে বাইরে পড়লেই চোখে পড়ে এই ধরনেরই একটি মন টেনে নিয়ে যাওয়া বাড়ি। সুদীর্ঘ ভবন। দোতলা। রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল। সাদা আর ফিকে সবুজ রঙ ছাড়া বিশেষ কোনো রঙের আধিক্য নেই। সামনের টানা বারান্দার ওপরে অনেকটা ছাতার মত কাঠের ঢালু ছাউনি। জানলায় জানলায় কাঠের খড়খড়ি। দুটির কোনোটিই আধুনিক ইমারতে দেখা যায় না। এ বাড়িও আধুনিক নয়। গঠন-কৌশল সেকেলে—বাংলার পল্লী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। পথচারী আকৃষ্ট হয় বোধ-হয় শুধু এই কারণেই —মার্কিন-প্রভাব বর্জিত বলেই।

এ বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হেন ব্যক্তি নেই যে আনমনা হয়ে যায় না। যারা একটু কল্পনাপ্রবণ, তারা ভাবে অন্য কথা। ভাবে, এ সেই জাতের বাড়ি যাদের ইট-কাঠ পাথরে লুকিয়ে থাকে বহু কাহিনী ; মনে হয়, কত দিন, কত মাস, কত বর্ষের অসহ্য নীরবতার পর ওরা কিছু বলতে চায়।

আর সত্যিই, এ বাড়িরও একটা কাহিনী আছে। শোনবার মতই চমকপ্রদ সেই কাহিনী। অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে বাড়িটির মূক দেওয়ালগুলো।

সেই গল্পই শোনাই এবার·········

সেদিন ছিল বেস্পতিবার। বিকেল সাড়ে চারটার সময়ে সেকেলে বাড়িটার সামনে দিয়ে গেলে দেখা যেত সামনের দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে মস্ত পাইপ টানতে টানতে বেরিয়ে আসছে খর্বকায় ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল; পাশে বেজায় ঢ্যাঙা বন্ধু রাঘব হাজরা—মুখে তার বেজায় পুঁচকে একটা সিগারেট।

এই দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনারা আগ্রহী হোন আর না হোন, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সাদা সবুজ বাড়ির সদর দরজা খুলে যাওয়ার পর তো কেবলমাত্র এই দুই কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুই দেখা যায়নি, দেখা গেছিল আরও কতকগুলি বিচিত্র দৃশ্য। প্রতিটিই এ বাড়ির বৈশিষ্ট্য। গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। তা না হলে বিয়োগান্ত এই গল্পটি শুধু বুঝতেই অসুবিধে হবে না, খোলা দরজাপথে যা-যা দেখা গেছিল, সেগুলোও উপলব্ধি করতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হবে।

ইংরেজ "T" অক্ষরের প্ল্যানে তৈরী হয়েছে পুরো বাড়িটা। কিন্তু এই T-এর আড়াআড়ি মাথাটা যতটা লম্বা, সে অনুপাতে নিচের ল্যাজটুকু অনেক ছোট। লম্বা মাথাটা হল রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল সামনের অংশটা। ঠিক মধ্যিখানে সদর দরজা। দোতলা। প্রায় সবকটা দরকারী ঘরই রয়েছে সামনের এই অংশে। ছোট্ট ল্যাজটুকু শুরু হয়েছে সদর দরজার ঠিক পেছন থেকে। একতলা। মাত্র দুটি লম্বা ঘর ছাড়া এদিকে আর কোনো ঘর নেই। পর পর দুটি ঘর—একটির মধ্যে দিয়ে অপরটিতে যেতে হয়।

স্বনামধন্য কবি ত্রিশঙ্কু বটব্যাল কাব্য-রচনা করেন প্রথম

ঘরটিতে। এইটিই তাঁর স্টাডি অথবা কাব্যমন্দির। তাঁর সব কটি আগুন-ছড়ানো বন্য কবিতার জন্ম এই ঘরটিতেই।

পরের ঘরটি কবির কনজারভেটরী অর্থাৎ গাছের ঘর। দিশি-বিলিতি কত বিচিত্র ফুলের বাহার সে ঘরে। কাঁচের ঘর। ছাদটুকু বাদে চারদিকেই লম্বা লম্বা কাচের ফ্রেম। সেই বিশেষ অপরাহ্নে সূর্যের ঝকঝকে আলোয় আগুনের মতই জ্বলছিল অতিকায় কতকগুলো ফুল। যেন রামধনু রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল দানবিক সৌন্দর্যে ভরা সেই অপরূপ গ্রীনহাউস।

সেই কারণেই হলঘরের দরজা খুলে গেলেই পথচারীকে থমকে দাঁড়াতে হত। না দাঁড়িয়ে পারত না। অবাক বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হত সেই বিচিত্র সুন্দর দৃশ্য। যাদুমন্ত্রবলে ধূলি-মলিন এই পৃথিবীরই দুটি ঘর যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে রূপকথার মায়া কক্ষে; রক্তমেঘ, সোনা সূর্য আর লোহিত নক্ষত্র যেন একই সঙ্গে নেমে এসেছে সে কক্ষে; স্পষ্ট অথচ স্বচ্ছ—ধরা ছোঁওয়ার অনেক বাইরে।

অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে এই মায়ারূপ সৃষ্টি করেছেন ত্রিশঙ্কু বটব্যাল স্বয়ং। এ ঘরের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তাঁর মনকে, তাঁর ব্যক্তিত্বকে এবং তাঁর প্রতিটি গনগনে কবিতাতে আছে এ ঘরের প্রভাব। রঙ তিনি পান করেন, রঙে তিনি স্নান করেন, রঙই তাঁর আত্মা, রঙই তাঁর ধ্যান, রঙের নেশায় তিনি বুঁদ হয়ে থাকেন অহোরাত্র। এই কারণেই তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে অজস্র রঙের মাতামাতি। ভয়ংকর এমন কি নিষ্ঠুর রঙের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মহাকাব্য কল্পনার প্রচেষ্টা তিনি করেছেন, জ্বলন্ত সোনা আর রক্তলাল তামা দিয়ে আকাশকল্পনা করেছেন; তাঁর কল্পনার দ্বিগ্বিজয়ী বীর ময়ূরকণ্ঠী রঙমাখানো হাতি চড়ে যুদ্ধযাত্রা করেছে; পর্বতাকার হীরায় আগুন লাগিয়ে আশ্চর্য রঙের রোশনাই ছড়িয়েছে। উদ্ভট অদ্ভুত এই কল্পনাবিলাসের মধ্যে কবির

কবিত্ব সব সময় সার্থক হয়ে না উঠলেও চেষ্টার কসুর করেননি তিনি।

বৈপ্লবিক এক্সপেরিমেণ্টের দিক দিয়ে ত্রিশঙ্কু নিঃসন্দেহে জিনিয়াস। রঙের নেশা ছাড়াও তাঁর আর একটি নেশা আছে। আফিমের নেশা। আফিমের ঘোর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মুড ভাল থাকে তাঁর। ঘোর কাটলেই খিটখিটে মেজাজের খিঁচুনিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা এবং আদর্শ গৃহিণী। স্বামীর আফিমকে তিনি ঘৃণা করেন। প্রতিবাদ করেন আরও একটি ব্যাপারে। বেশ কয়েক মাস হল ভস্মাচ্ছাদিত এক নাগা সন্ন্যাসীকে ঠাঁই দিয়েছেন ত্রিশঙ্কু। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যেই এহেন মুনি-প্রবরকে কাছছাড়া করতে তিনি নারাজ। শ্রীমতী বটব্যালের দুচোখের বিষ নেংটি পরা এই কদাকার সন্ন্যাসীটি।

এ হেন আর্ট-হাউসেরই সদর চৌকাঠ পেরিয়ে এল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল এবং তার বন্ধু। বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দুজনে—অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হল। ত্রিশঙ্কু বটব্যাল রাঘব হাজরার পুরনো বন্ধু। দুরন্ত ছাত্রজীবনের বন্ধুত্ব। তাই ফুরসৎ পেয়েই ফাদার মণ্ডলকে নিয়ে এসেছিল হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে যদি ফিরে পাওয়া যায়, এই আশায়।

কিন্তু নিরাশ হয়েছে রাঘব। ত্রিশঙ্কু আর সে ত্রিশঙ্কু নেই। বিশেষ করে রাঘবের সাম্প্রতিক দায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপের পর কবি ত্রিশঙ্কুর আফিম আর প্রলাপ কবিতাকে কোনমতেই বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে করার জন্যে এর চাইতে নিকৃষ্ট পথ নাকি আর নেই। চৌকাঠ পেরিয়েই ক্ষণেকের জন্যে থমকে দাঁড়ালো দু' বন্ধু। তারপর যেই বাগানের পথে মোড় ঘুরতে যাবে, অমনি দড়াম করে খুলে গেল বাগানের সামনের দরজা। ছন্ন-ছাড়া চেহারার এক তরুণ

দমদেওয়া কলের পুতুলের মতো বাঁই-বাঁই করে এসে দাঁড়ালো সামনে।

রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল—"ত্রিশঙ্কু বটব্যালের,সঙ্গে দেখা করতে চাই। দেখা আমি করবই। আছেন তো?"

যুবকের আদ্দির পাঞ্জাবী দেখে সন্দেহ হয় রাত্রে বালিশের ভূমিকা নিতে হয়েছিল বেচারী জামাকে। আঙুলগুলো সরুসরু—গাঁটযুক্ত বেতের মত। মট-মট করে অস্থিরভাবে আঙুল মটকানোর বহর দেখে করুণা হল ঘনশ্যামের।

বলল—"আছেন। তবে দেখা হবে কিনা সন্দেহ। ঘরে ডাক্তার রয়েছেন।"

কথাটা কানে না তুলে হুড়মুড় করে হলঘরে ঢুকে পড়ল উদভ্রান্ত যুবক। হাবভাব দেখে মনে হল আদব-কায়দা তার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রিশঙ্কুর কাব্যমন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে স্টেথিসকোপটা পকেটে রাখতে রাখতে ভ্রূভঙ্গী করে বললেনঃ

"ত্রিশঙ্কুবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চান? না, তা সম্ভব নয়। কোনমতেই নয়। আপনি কেন, কেউই ওঘরে ঢুকবে না এখন। ঘুমের ওষুধ দিয়ে এলাম আমি", বলে পা বাড়ালেন ডাক্তার।

পেছন থেকে তাড়াতাড়ি কোট চেপে ধরে এক নিঃশ্বাসে বললে যুবক—"কিন্তু আমি দেখা করতে চাই। বড় বিপদে পড়েছি। একবারটি কথা বলতে চাই।"

এক ঝটকায় কোট ছাড়িয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন ডাক্তার—"লালুবাবু, বৃথা চেষ্টা করছেন। ওষুধের ঘোর কাটাতে যদি পারেন, তাহলেই আমি রাজী হতে পারি।"

ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে গেছিল লালুবাবু নামধারী উঞ্ছ চেহারার যুবক। সেই অবসরে চৌকাঠ পেরিয়ে বিকেলের রোদ্দুরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। ভদ্রলোক বৃষস্কন্ধ। হিটলারী গোঁফ।

চোখ-মুখ সপ্রতিভ। সাদা-সিদে চেহারা হলেও হাবভাব অত্যন্ত চটপটে।

কোট টেনে ধরা ছাড়া ভদ্রলোকের মনোযোগ আকর্ষণ করার আর কোনো কৌশল লালুবাবুর জানা ছিল না বোধহয়। তাই অসহায় চোখে বাগানের খর্বকায়, দীর্ঘকায় ও হৃষ্টপুষ্ট তিন মূর্তির পানে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করা ছাড়া আর কোন পথ রইল না তার।

হাঁটতে হাঁটতে হাসিমুখে বললেন ডাক্তার—"স্রেফ ধাপ্পা। ত্রিশঙ্কুবাবুকে এখনও ঘুমের ওষুধ দিইনি—আধ ঘণ্টাটাকে পরে দেব। কিন্তু এই লম্পট ছোকরাটাকে আমি ভাগাতে চাই। টাকা ধার ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ছোকরা এ পথ মাড়ায় না। ত্রিশঙ্কুবাবুর আপন শালা হলে কি হবে, এরকম নষ্টচরিত্রের বাঁদর আমি আর দুটি দেখিনি। কিন্তু ছোকরার দিদিকে দেখলেন তো? দেবীর মত।"

"সত্যিই দেবীর মত," সায় দিল ঘনশ্যাম মণ্ডল।

"জানোয়ারটা বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত আমার থাকা দরকার", বললেন ডাক্তার। "বাগানেই পাইচারী করা যাক। তারপর ওষুধ নিয়ে ত্রিশঙ্কুবাবুর কাছে যাওয়া যাবে 'খন। লালুবাবুর সাধ্য নেই ভেতরে ঢোকে। দরজায় চাবি দিয়ে দিয়েছি।"

রাঘব বলল, "ডক্টর ভড়, তার চাইতে চলুন সবাই মিলে কনজারভেটরীর পেছনে যাওয়া যাক। বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকার পথ না থাকতে পারে, দেখতে তো বাধা নেই। দেখার মত ঘর, না কি বলেন?"

"মন্দ নয়, তাই চলুন। সেই ফাঁকে আমার পেসেন্টের ওপরেও চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাবে'খন" বললেন ডাক্তার ভড়। "ত্রিশঙ্কুবাবু শত খেয়ালের অন্যতম খেয়াল হল যখন-তখন কাচের ঘরে রক্ত-লাল ফুলগুলোর মধ্যে সোফায় শুয়ে থাকা। এতে নাকি যে রোমাঞ্চের

সৃষ্টি হয়, তাতে তাঁর কল্পনা দুর্বার হয়ে ওঠে। ও কি করছেন ?”

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে গেছিল ফাদার মণ্ডল। পরক্ষণেই হেঁট হয়ে লম্বা ঘাসের মধ্যে থেকে তুলে আনলে অদ্ভুত আকারের একটা বেঁকানো ছোরা। ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কি করে যে ঘনশ্যাম মণ্ডলের কুৎকুতে চোখে জিনিসটা ধরা পড়ল, সে রহস্য নিয়ে তখন মাথা ঘামানোর কথা কারো মনেই হল না। রঙিন রত্নখচিত সুদৃশ্য হাতল আর সাপের ফনার মত ঝকঝকে শাণিত ফলার দিকে সম্মোহিতের মত নিবদ্ধ হয়ে রইল তিন জোড়া চক্ষু।

বিরূপ চোখে ছোরাটাকে উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে বললে পাদরী, “কার ছোরা ?”

“আবার কার, ত্রিশঙ্কুবাবুর নিশ্চয়,” ঈষৎ ঝাঁঝালো স্বরে বললেন ডাক্তার। “চীন-জাপান-তিব্বতের কতরকমের বিদকুটে জিনিস যে ভদ্রলোক সংগ্রহ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। নাগা সন্ন্যাসীটারও হতে পারে। সন্ন্যাসী অন্তপ্রাণ তো।”

“কে নাগা ?” ছোরাটার ওপর থেকে চোখ না তুলে শুধোলো ঘনশ্যাম মণ্ডল।

“নামেই নাগা সন্ন্যাসী, ব্যাটা তন্ত্র-মন্ত্র জানুক না জানুক, ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছু জানে নিশ্চয়” হাল্কা স্বরে বললেন ডক্টর ভড়। “পয়লা নম্বরের ঠগ কোথাকার !”

“ম্যাজিকে আপনার বিশ্বাস নেই ?” চোখ না তুলে জানতে চায় ফাদার মণ্ডল।

“ম্যাজিক মানেই হাতের কারসাজি ! ফাঁকা ভেলকি !”

“অপূর্ব !” স্বর নামিয়ে স্বপ্ন-বিহ্বল সুরে বলল পাদরী। “অদ্ভুত সুন্দর রঙের খেলা ! কিন্তু বেয়াড়া আকার।”

“কিসের আকার ?” বড় বড় চোখ করে জিগ্যেস করল রাঘব।

“সব কিছুর। বেয়াড়া আকারটা এক্ষেত্রে অ্যাবসট্রাক্ট। এমন মাতাল করা নেশা ধরানো সুন্দর রঙ। অথচ আকারটা রীতিমত জঘন্য, কুৎসিত। জঘন্য আর কুৎসিত দেখানোর জন্যেই এমন আকারের পরিকল্পনা।”

“সে কি কথা!” হাসিমুখে বলল রাঘব হাজরা।

“এমন অনেক ভাষা আছে, যার সব অক্ষর বা প্রতীকের সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকলেও আমি বুঝি কোথাও না কোথাও অশুভ কিছু লুকিয়ে রয়েছে,” ধীরে ধীরে আরও খাদে নেমে আসতে থাকে পাদরীর স্বর; প্রায় ফিসফিস সুরে বলে চলে—“লাইনগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বেয়াড়াভাবে এঁকেবেঁকে যায়—সাপের মতই কিলবিলিয়ে ওঠে।”

“এ আবার কি ধরনের প্রলাপ?” অট্টহাস্য করে বললেন ডাক্তার।

ধীরস্থির কণ্ঠে জবাব দিলে রাঘব হাজরা—“মধ্যে মধ্যে এই রকম হয়ে যান ফাদার। মনে হয় ইহজগতে থেকেও নেই। কিন্তু আপনি হুঁশিয়ার থাকতে পারেন। কেননা, যতবার এরকম হয়েছে, ততবারই একটা না একটা অমঙ্গল ঘটতে আমি দেখেছি।”

আচমকা ছোরাটাকে বাড়িয়ে দিল ফাদার মণ্ডল। হাতের তেলোয় ঝকমকে সরীসৃপের মতই যেন কিলবিলিয়ে উঠল ক্রূরভাবে বাঁকানো ফলাটা। “বেয়াড়া আকারটা চোখে পড়ছে না আপনার? যে উদ্দেশ্যে এ জিনিসের সৃষ্টি সে উদ্দেশ্য সরল নয়, সিধে নয়। বর্শার মত সোজা নয়, তরবারির মত ঢেউ খেলানোও নয়। এ ছোরা দেখলে হাতিয়ার বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন অত্যাচারের যন্ত্র।”

উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন ডাক্তার—“দেখছি, ছোরাটা আপনার চোখের বালি হয়ে উঠেছে। দিন আমাকে—সন্ন্যাসীর জিনিস সন্ন্যাসীকেই ফিরিয়ে দেব'খন। কি মুশ্‌কিল! কনজারভেটরীর

শেষ নেই নাকি ? ফাদার, এ বাড়িটাও বেয়াড়া আকারের, না কি বলেন ?”

মাথা নাড়তে নাড়তে ফাদার মণ্ডল বলল—“উঁহু, বাড়ির আকারটা একটু অদ্ভুত বটে, হাস্যকরও বলা চলে, তবে বেয়াড়া নয়।”

গোটা একখণ্ড কাঁচে তৈরী বৃত্তাকার কোণটা পেরোতেই সব্‌জি-কক্ষের এক প্রান্তে এসে পৌঁছোলো তিনজনে। পেল্লায় কাঁচে কোনো জোড় নেই, জানলা নেই, দরজা নেই, কাজেই ভেতরে ঢোকার রাস্তাও নেই। কিন্তু ধূলিহীন তকতকে কাচের ওপর এক সূর্য লক্ষ সূর্য হয়ে আশ্চর্য রোশনাই ছড়াচ্ছিল : সুগোল কাচের ওপারেই অজস্র রঙীন ফুলের মাঝে নীলসায়রের মত হাল্কা রঙের সোফায় শুয়েছিলেন কবি ত্রিশঙ্কু বটব্যাল। পাশে আধ খোলা একটা বই। যেন, বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরনে মাখন রঙের সিল্কের ঢিলেহাতা পাঞ্জাবী আর নিষ্প্রভ হলুদ রঙের সিল্কের পায়জামা। শীর্ণ মূর্তি। কেশবিরল চেকনাই মাথা। আর, অদ্ভুত ছুঁচোলো দাড়ি। ফুলঘরের সঙ্গে নেহাতই বেমানান এই দাড়ি কবিপ্রবরের বড়ই প্রিয়।

ত্রিশঙ্কুর মুখশ্রীর সঙ্গে তিনজনেরই বিলক্ষণ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও হয়ত আরও একদফা ঘুমন্ত দৌন্দর্য দেখতে কারোরই আপত্তি থাকত না। কিন্তু তখন আর এই বিচিত্র রূপের দিকে দৃষ্টি ছিল না কারোরই। তিনজনেরই চোখ স্থির হয়েছিল অদূরে দণ্ডায়মান একটি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তির ওপর।

কনজারভেটরীকে বেড় দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে গেছে। রাস্তার ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ছিল দীর্ঘ মূর্তিটা। কটিতে একফালি নেংটি না থাকলে তাকে দিগম্বরই বলা চলত। আপাদমস্তক ভস্মাচ্ছাদিত। সিংহের কেশরের মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সাদা চুল ; কিছুটা জটা, কিছুটা খোলা। পড়ন্ত রোদ্দুরে অদ্ভুত ব্রোঞ্জের

মতই ঝকঝক করছিল তার সাদা চুল, সাদা গা। কাচের মধ্যে ঘুমন্ত কবির পানে তাকিয়েছিল ব্রোঞ্জমূর্তি। অনড়। অচঞ্চল। পর্বতের চাইতেও স্থির, শান্ত।

"কে ও?" অজগরের মত অকস্মাৎ হিসহিসিয়ে উঠে রুদ্ধশ্বাসে জিগ্যেস করল ফাদার মণ্ডল।

"সেই নাগা হামবাগ," ব্যাজার মুখে বললেন ডাক্তার। "কিন্তু এখানে ওর কি দরকার?"

"হিপনোটিজ্‌ম্ হতে পারে," ঠোঁট কামড়ে বলল রাঘব।

"হিপনোটিজ্‌ম্ না ছাই। কিছু সরাবার মতলব আছে নিশ্চয়!" রাগতস্বরে বললেন ডাক্তার।

"বেশ, বেশ, জিজ্ঞেস করেই দেখা যাক না," বলে, রাঘব হাজরা তৎক্ষণাৎ তিন লাফে হাজির হলো ছাইঢাকা মূর্তির সামনে। অযথা হাত-পা গুটিয়ে বাক্যজাল বুনে থিওরী সৃষ্টি করার পক্ষপাতী নয় রাঘব। সে চায় কাজ। সুতরাং তালঢ্যাঙা নাগার মাথার ওপরেও মাথা তুলে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে শুধোলে অমায়িক ভঙ্গিমায়:

—"নমস্কার। কিছু চাই নাকি?"

অত্যন্ত আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো ভস্মাচ্ছাদিত দীর্ঘ মূর্তি। বন্দরে ভেড়বার সময়ে যেমন ধীর গতিতে মুখ ঘোরায় জাহাজ, সেইভাবে বলিরেখাংকিত সাদা মুখ ঘুরে গেল রাঘবের দিকে। আশ্চর্য! সন্ন্যাসীর দুই চোখ প্রায় মুদ্রিত; অবিকল ঘুমিয়ে থাকা চোখের মতই। খাঁটি বাংলা বেরিয়ে এল দ্বিধাবিভক্ত সাদা অধরোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে, "কিচ্ছু চাই না।" তারপর, চোখের পাতা অর্ধেক খুলে গেল; লাল টকটকে চক্ষুগোলকের সামান্য অংশ বার করে পুনরাবৃত্তি করলে, "কিচ্ছু চাই না।" তারপর, পুরোপুরি চোখ খুলে বললে "কিচ্ছু চাই না।" পরক্ষণেই খস-খস করে ওড়া পাতার মতই অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনকার বাগানে।

"লোকটার সৌজন্যবোধ একেবারেই নেই," বললে ফাদার মণ্ডল। "আসলে কিছু চায় ও।"

"কিন্তু কি মতলবে এখানে দাঁড়িয়েছিল বলুন তো?" কপাল কুঁচকে খাটো গলায় শুধোলো রাঘব।

"এ নিয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব'খন," বলল পাদরী।

শেষরশ্মি বিলিয়ে দিগন্তে ডুব দিয়েছিল তপনদেব। ম্লান হয়ে আসছিল আলো, কোণে কোণে জমছিল আঁধার। গোধূলির রক্তাভায় লাল হয়ে উঠেছিল গাছের চূড়ো, কিন্তু ধীরে ধীরে কালো হয়ে উঠছিল ঝোপ-ঝাড়, ডালপাতা। কনজারভেটরীকে পাক দিয়ে ওপাশে পৌঁছোলো তিনমূর্তি। নীরবে হাঁটতে লাগল সামনের দরজার দিকে।

ঠিক তখনি কি যেন নড়ে উঠল কাব্যমন্দির আর মূল বাড়ির কোণে; পায়ের শব্দে পাখি যেমন চমকে ওঠে ঠিক তেমনিভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে সচকিত হয়ে উঠল একটা ছায়ামূর্তি এবং ছায়ার মধ্যে থেকে যেন পিছলে বেরিয়ে এল ভস্মাচ্ছাদিত নাগার শ্বেতমূর্তি; প্রায় নিঃশব্দে দ্রুতবেগে সে মূর্তি এগিয়ে গেল বাড়ি ঘুরে সামনের দরজার দিকে।

এই নিয়ে দুবার হল। অদ্ভুত পরিবেশে অদ্ভুতভাবে দেখা গেল রহস্যময় সন্ন্যাসীকে। কিন্তু অবাক হওয়ার তখনও অনেক বাকী। কেননা, এরপরেই ছায়ার মধ্যে থেকে যাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউই।

মেঘবরণ চুল এলিয়ে কালো চোখে কাজলা দীঘির রূপ ফুটিয়ে এগিয়ে এলেন ত্রিশঙ্কু-গৃহিণী। ঈষৎ আড়ষ্ট দেহ, কিন্তু স্মিতমুখ।

অপরিসীম বিস্ময়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেছিল তিনজনেই। আসন্ন সন্ধ্যায় এহেন নিভৃত কোণে নাগা সন্ন্যাসী তাহলে একাকী ছিল না।

"নমস্কার ডাক্তারবাবু," ওষ্ঠপ্রান্তে মিষ্টি হাসি তুলিয়ে বললেন, কবি-জায়া।

"নমস্কার," ঝটিতি মুখর হয়ে উঠলেন ডাক্তার। "আপনার স্বামীকে ঘুমের ডোজ দিতে চলেছি।"

"দেওয়ার সময়ও হয়েছে," বলে সবার দিকে পাইকারী হাসি নিক্ষেপ করে চকিতে বাড়ির মধ্যে অন্তর্হিতা হলেন কবি-পত্নী।

ফাদার মণ্ডল এতক্ষণ পরে মুখ খুলল। বলল—"এ ধরনের মেয়েরা বিশ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য করে যায়। তারপরেই এমন কিছু করে বসে যা সত্যিই ভয়াবহ।"

সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন ডক্টর ভড়—"আপনি ডাক্তারী পড়তেন নাকি?"

"দেহের সঙ্গে মনকেও জানতে হয় আপনাদের। আর আমাদের জানতে হয় মনের সঙ্গে দেহকেও," বলে চুপ করে গেল ঘনশ্যাম মণ্ডল।

কথা বলতে বলতে বাড়ির সমান্তরাল অংশের কোণ ঘুরে সামনের দরজার দিকে এগোচ্ছিল তিনজনে। দরজায় ঢুকতে না ঢুকতেই তৃতীয়বার দেখা গেল ছাইমাখা শ্বেতমূর্তিকে। দরজার দিকে বেগে এগিয়ে এল কিম্ভূতকিমাকার সেই মূর্তি—এমন বেগে যে মনে হল কামানের গোলার মতই যেন তা নিক্ষিপ্ত হল কাব্য-মন্দিরের ভেতর থেকে। কাব্যমন্দিরের দরজায় চাবি দেওয়া আছে জানা সত্ত্বেও অবাস্তব সম্ভাবনাটা চকিতে ঝলসে উঠল প্রত্যেকেরই মগজে।

ফাদার মণ্ডল আর রাঘব হাজরা এই অলৌকিক চিন্তা নিয়ে আলোচনা না করাই সঙ্গত মনে করল। ডক্টর ভড় কাজের মানুষ। এ সব বাজে কল্পনা নিয়ে সময় কাটানোর পাত্র তিনি নন। কাজেই সর্বত্র বিরাজমান মুনিপ্রবরকে দরজাপথে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়ে পা বাড়ালেন হলঘরের মধ্যে। হলঘরে পা দিতে না দিতেই

চোখে পড়ল আর একটা মূর্তিকে—যার কথা বেমালুম ভুলে গেছিলেন ভদ্রলোক। নাছোড়বান্দা লালুবাবু তার গাঁটযুক্ত বেতের মত আঙুল দিয়ে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে অস্থির চরণে চর্কিপাক দিচ্ছিল ঘরের মধ্যে। দেখেই পিত্তি জ্বলে গেল ডক্টর ভড়ের। বিরক্তমুখে সঙ্গীদের দিকে ফিরে চাপা দ্রুতস্বরে বললেন—“ভেতরে ঢুকেই দরজায় চাবি দেব—তা না হলে ছুঁচোটা ঢুকে পড়বে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বেরিয়ে আসছি।”

চটপট চাবি ঘুরিয়েই ভেতরে ঢুকে আবার খটাং করে পাল্লা বন্ধ করে চাবি ঘুরিয়ে দিলেন ভড়। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই সরোষ হুঙ্কার ছাড়ল লালুবাবু, কিন্তু নির্বিকারে তা হজম করে নিয়ে মুখের ওপরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন ডাক্তার। গজ-গজ করতে করতে ধপাস করে হলঘরের একটা চেয়ারে বসে পড়ল লালুবাবু। চন্দ্রনাথ দে-র একটা তৈলচিত্র ঝুলছিল দেওয়ালে। স্প্যাচুলা টেকনিকে আঁকা নাগানৃত্য। সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাঘব হাজরা। নিষ্প্রভ চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। অনেকটা আচ্ছন্নের মত। মিনিট চারেক পরেই আবার খুলে গেল দরজা। এবার ক্ষিপ্রতায় ডাক্তারকে টেক্কা দিলে লালুবাবু। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পৌঁছালো দরজার সামনে। পরক্ষণেই দু হাতে পাল্লা দুহাট করে দিয়ে হেঁকে উঠল নেহাতই অভব্যের মত—“জামাইবাবু, আমি—”

কাব্যমন্দিরের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল কবি ত্রিশঙ্কুর আশ্চর্য মেয়েলী কণ্ঠ; অনেকটা হাই তোলা আর খানিকটা কাঁসার ঘণ্টার মত হাসি হেসে বললে মিহিকণ্ঠে—“জানি তোমার কি চাই। এই নাও। আর জ্বালিও না, বিদেয় হও আজকের মত। ময়ূরের বিরহ নিয়ে এখন কবিতা লিখছি আমি।”

কথার মাঝখানেই শূন্যপথে উড়ে এল একটি চকচকে রৌপ্য-মুদ্রা এবং বিশ্বের সেরা গোলকীপারের মতই

বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় তা শূন্যপথেই খপ করে লুফে নিলে লালুবাবু।

পরমুহূর্তেই বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন ডাক্তার। রেগেমেগে কড়াৎ করে চাবি ঘুরিয়ে বেঁটে-ঢ্যাঙা দুই সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাগানে।

বললেন ফাদার মণ্ডলকে—"বেচারী ত্রিশঙ্কুবাবু এবার একটু শান্তি পাবেন ওঁরই ইচ্ছায় ঘণ্টাখানেক কি দুয়েকের জন্যে চাবি দেওয়া থাকবে দরজায়।"

"তা ঠিক," জবাব দিলে পাদরী মণ্ডল ; "গলা শুনে তো মনে হল দিব্বি ফূর্তিতে রয়েছেন," বলে গম্ভীরমুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন বাগানের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত। মোটামুটি হৃষ্টচিত্তে ছন্নছাড়া লালুবাবুকে রূপোর টাকাটা লোফালুফি করতে দেখা গেল এক দিকে। তারও ওদিকে ম্লানরক্ত গোধূলির পটভূমিকায়, ঘাসের কার্পেটের ওপর পদ্মাসন হয়ে বসেছিল নাগা সন্ন্যাসীর দীর্ঘ ঋজু মূর্তি। মুখ ফেরান রক্তমেঘের দিকে।

আচমকা জিজ্ঞেস করল ফাদার—"মিসেস বটব্যাল কোথায় ?"

"ঘরে", বললেন ডাক্তার। "ঐ তো ওঁর ঘর। সার্সির গায়ে মিসেস বটব্যালের ছায়াই তো দেখা যাচ্ছে।"

চোখ তুলল ফাদার মণ্ডল। ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি দিয়ে যেন গেঁথে ফেলতে চাইল দোতলার আলোয় উদ্ভাসিত কাচের জানালায় ছায়া দিয়ে গড়া নারীমূর্তিকে।

"মিসেস বটব্যালের ছায়াই বটে," বলে সে তিন পা এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ল বাগানের বেঞ্চির ওপর।

পাশে বসল রাঘব হাজরা ; কিন্তু ডক্টর ভড় চঞ্চল মানুষ। চুপচাপ বসে থাকা তাঁর ধাতে নেই। কাজেই ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্টীমারের মত ধোঁয়া ছাড়ভে ছাড়তে পায়চারী

করতে বেরুলেন গোধুলির ঘনায়মান অন্ধকারে। দুই বন্ধু ছাড়া আর কেউ রইল না বেঞ্চির ওপর।

কোমলস্বরে প্রশ্ন করল রাঘব হাজরা—“ফাদার কি হয়েছে আপনার?”…

আধ মিনিটের মত নীরব নিথর দেহে পাথরের স্ট্যাচুর মত বসে রইল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। তারপর বিড়বিড় করে অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বললে—“কুসংস্কার জিনিসটা অধর্ম। কিন্তু এখানকার হাওয়ায় এমন কিছু আছে…খানিকটা ঐ নাগা সন্ন্যাসীর জন্যেও হতে পারে।”

আবার নৈঃশব্দ্যের অতলে তলিয়ে গেল পাদরী। শূন্যদৃষ্টি মেলে অপলকে তাকিয়ে রইল দূরের সন্ন্যাসীর দিকে। শক্ত আড়ষ্ট দেহে সিধে হয়ে বসে যেন ধ্যান করছিল প্রায় দিগম্বর নাগা। প্রথমে মনে হয়েছিল অনড়। কিন্তু কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফাদার মণ্ডল দেখলে, মৃদুমন্দ হাওয়ায় যেমন গাছের কালো চূড়ো নড়তে থাকে অল্প-অল্প, ঠিক তেমনি নিয়মিত ছন্দে দুলছে ভস্মাচ্ছাদিত মূর্তি। হাওয়ায় বাগানের ঝরাপাতা উড়ছিল; মনে হল, সেই হাওয়াই সন্ন্যাসীর শুকনো কাঠের মত নীরস দেহটিকেই দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রহস্যময় ছন্দে।

দ্রুত নেমে আসছে সন্ধ্যার কালো অবগুণ্ঠন। ঝড় এল বোধহয়। ক্ষুব্ধ আত্মার আক্ষেপের মত দমকা হাওয়ার ঝলকে শিহরিত হচ্ছে দেবদারুর ডাল আর পাতা। বেঞ্চিতে বসে তখনও সবকটা মূর্তিকে দেখা যাচ্ছিল। উদাসীনভাবে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লালুবাবু। জানলার কাছে একইভাবে আসা-যাওয়া করছে কবি-পত্নীর কৃষ্ণছায়া; কনজারভেটরীর আশপাশে আলেয়ার আলোর মত দপ-দপ করে জ্বলে-জ্বলে উঠছে ডক্টর ভড়ের সিগারেটের আগুন। আর, একইভাবে খাড়া হয়ে বসে মৃদু-মৃদু দুলছে নাগা সন্ন্যাসীর আড়ষ্ট সমাহিত দেহ—মাথার ওপর

গাছগুলোও দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর দুলছে তালে-তালে। সত্যিই ঝড় এল তাহলে।

আনমনা স্বরে বলে চলল ফাদার মণ্ডল—"নাগা সন্ন্যাসীর প্রথম কথা শুনেই হঠাৎ যেন কি রকম হয়ে গেলাম ; মনে হল যেন দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছি। ছায়াছবির মতই মনের চোখে দেখলাম এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আর ঐ সাধুকে। কিন্তু তিনবারের বেশী মুখই খুলল না নাগা। প্রথমবার 'কিচ্ছু চাই না' শুনে মনে হল রীতিমত দুর্বোধ্য তার রহস্য। দ্বিতীয়বার 'কিচ্ছু চাই না' শুনে মনে হল, এই ব্রহ্মাণ্ডের মতই সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। তৃতীয়বার জ্বলন্ত চোখে 'কিচ্ছু চাই না' শুনে শুধু এই কথাই মনে হল যে, ইহলোকের ভোগবাসনা তার একেবারেই নেই ; মদ্য-মাংস কামিনী অর্থ—কোন কিছুর প্রতিই নেই তার আকর্ষণ ; আর—"

দু ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ল ; বিছের কামড় খাওয়ার মতই চমকে উঠল রাঘব হাজরা। ঠিক সেই মুহূর্তে দূর কনজারভেটরীর প্রান্ত ঘুরে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে লাগলেন ডক্টর ভড়।

রকেটের মতই প্রচণ্ড বেগে দুই বন্ধুর সামনে ছুটে এলেন ডক্টর ; ঠিক তখনি বাড়ির সামনের দরজার কাছাকাছি সহসা ঘুরে দাঁড়াল উঞ্ছ যুবক লালুবাবু। হাঁপাতে হাঁপাতে তারই কলার খামচে ধরে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলে ডক্টর—"পাজী বদমাস কোথাকার।"

নিমেষে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। ইস্পাত-কঠিনকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল আদেশের ডঙ্কা—"মারধর করবেন না। এক-আধজনকে আটকে রাখার মত শক্তি আমাদের আছে। কি ব্যাপার ডক্টর ?"

"ত্রিশঙ্কুবাবুর অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না," কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললেন ডাক্তার। "কাঁচের এপাশ থেকে

দেখছিলাম। ওঁর শোয়ার ধরনটা যেন কি রকম। যে অবস্থায় রেখে দরজা বন্ধ করেছিলাম সে রকম নয়।"

"ভেতরে গিয়ে দেখা যাক," সংক্ষেপে বলল ফাদার মণ্ডল। "লালুবাবুকে এইখানেই রেখে যেতে পারেন। ত্রিশঙ্কুবাবুর গলা শোনার পর থেকে আমার দৃষ্টির বাইরে উনি যান নি।"

দ্রুতস্বরে বললে রাঘব—"লালুবাবুর ওপর নজর রাখছি আমি। আপনারা ভেতরে গিয়ে দেখুন।"

বৃষস্কন্ধ ডাক্তার আর বামনমূর্তি পাদরী এক জোড়া উড়ন্ত জেপেলিনের ক্ষুদ্র সংস্করণের মতই পলকের মধ্যে পৌঁছোল কাব্য-মন্দিরের দরজার সামনে। চাবি ঘুরল। দরজা খুলল। পরমুহূর্তেই হুড়মুড় করে একই সঙ্গে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এবং একপাশে বসানো পেল্লায় টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলে কোন রকমে। মেহগনী কাঠের সুদৃশ্য টেবিল। এক-একটি পায়া চৈনিক উপকথার এক-একজন বিকট দানোমূর্তি। এক বিঘৎ উঁচু প্যাগোডার ধাঁচে তৈরী কিম্ভূতকিমাকার একটা টেবিল ল্যাম্প। মৃতের মত বিবর্ণ রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল প্যাগোডার তলা দিয়ে। কবি ত্রিশঙ্কু বটব্যালের কাব্যকল্পনার অন্যতম প্রেরণা এই টেবিল, এই প্যাগোডা, আর এই পরিবেশ।

টেবিলের ঠিক কেন্দ্রে, প্যাগোডো-বাতিদানের পাশে পড়েছিল এক তা কাগজ। শুধু এক তা কাগজ। আর কিছু না। অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে সে কাগজ।

ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিলেন ডাক্তার। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে তুলে দিলেন পাদরীর হাতে। দম-আটকানো কণ্ঠে কোনমতে "সর্বনাশ হয়ে গেল" বলেই সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ওপাশে কাচের ঘরের মধ্যে। অপরাহ্নের সূর্যোকরোজ্জ্বল ভয়ানক রঙিন স্মৃতি নিয়ে সে-ঘর তখন নীরন্ধ্র অন্ধকারে মুমূর্ষপ্রায়।

বারবার তিনবার কাগজের ওপর চোখ বুলোলো ফাদার মণ্ডল। তারপর নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। মাত্র কটি শব্দ লেখা ছিল কাগজেঃ 'মরছি নিজের হাতে তবু আমি নিহত!' কবি ত্রিশঙ্কুর অননুকরণীয় এবং রীতিমত দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর।

এবার কাগজটা নিয়েই কনজারভেটরীর দিকে পা বাড়ালো ফাদার মণ্ডল। মাঝপথেই মুখোমুখি হয়ে গেল ভড়ের সঙ্গে। সারা মুখে তাঁর নিঃসীম বিহ্বলতা।

"সব শেষ! সব শেষ!" খাবি খেতে খেতে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললেন ডাক্তার।

রডোডেনড্রন, অর্কিড আর জানা-অজানা ফুলের জমকালো অথচ অস্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে পদার্পণ করলো দুই খর্বকায় মূর্তি। সোফার ওপর শুয়েছিলেন দুঃসাহসী কবি ত্রিশঙ্কু বটব্যাল! মাথাটা ঝুলছে বাইরে—বিরল কেশের ক্ষীণ একটি গুচ্ছ মেঝে স্পর্শ করছে। বুকের বাঁদিকে আমুলবিদ্ধ একটা ছুরিকা। কবির অবশ হাতের মুঠিতে তখনও ধরা রয়েছে হাতলটা। বাগানে এই ছোরাটাই ঘাসের অন্তরাল থেকে আবিষ্কার করেছিলেম ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

কোথা থেকে বিকটস্বরে ডেকে উঠল একটা তক্ষক—বুক চাপড়ানোর মত আওয়াজ করে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের মত হু-হু করে ঝড় এল বাইরে। সেই সঙ্গে খ্যাপাবৃষ্টি। কিছুক্ষণ আগেও যে কাচঘর লাখো রোশানাইয়ের ছটায় অমরাবতীর মত ঝলমল করছিল, এখন তাও কবরের মত হিম স্তব্ধ। যেন আচমকা সারেঙ্গীর তার ছিঁড়ে গেছে ঘুঙুর আর্তনাদ করে উঠেছে—গীতস্তব্ধ কক্ষের দুঃসহ আতঙ্কভার বুকের ওপর চেপে বসছে···

বিকৃত ভঙ্গিমায় শায়িত লাশের চাইতে হাতের কাগজটাই ফাদার ঘনশ্যামের কাছে বেশী আকর্ষণীয় মনে হল। চোখের খুব কাছে এনে, কাব্যমন্দির থেকে বিচ্ছুরিত অতি-ক্ষীণ আলোকে কি যেন দেখতে লাগল পাদরী। তারপর ম্লান আলোর পটভূমিকায়

কাগজটাকে মেলে ধরল ঘনশ্যাম। ঠিক সেই মুহূর্তে বাজ পড়লো কোথাও। চরাচর ব্যাপ্ত করে ঝলসে উঠল প্রচণ্ড প্রখর বিদ্যুৎ।

আলোর পরেই অন্ধকার। বিদ্যুতের পরই তমিস্রা। বাজের কড়কড় শব্দ মিলোতে না মিলোতেই আঁধারের মধ্যে থেকে শোনা গেল ফাদার মণ্ডলের কণ্ঠ—"ডকটর, কাগজটা বেয়াড়া আকারের।"

"তার মানে?" ভ্রূকুটি করে জানতে চাইলেন ভড়।

"কাগজটা চৌকো নয়। এক কোণ থেকে খানিকটা কিনারা কেটে নেওয়া হয়েছে কেন বলুন তো?"

"আরে গেল যা, আমি কি জানি তার?" গরগর করে উঠলেন ডাক্তার। "ত্রিশঙ্কুবাবুকে এখন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। আপনি কি বলেন? দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।"

"না। যেরকমভাবে আছেন উনি, ঐ ভাবেই থাকুন। পুলিশকে খবর পাঠাতে হবে এখন," একইভাবে কাগজটা উল্টে-পাল্টে নিবিষ্টমনে দেখতে দেখতে বললে ফাদার মণ্ডল।

কাব্যমন্দিরের টেবিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে আচমকা থমকে দাঁড়াল ঘনশ্যাম পাদরী। মুখকাটা ছোট্ট একটা কাঁচি তুলে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"এই তো! কাগজকাটা হয়েছে এই কাঁচি দিয়েই। কিন্তু—," আবার গ্রন্থিল হয়ে উঠল ঘনশ্যামের ললাট।

চটে গিয়ে বললেন ডাক্তার—"উঃ, দয়া করে আপনার এই পাগলামো বন্ধ করবেন কি? পুঁচকে একটা কাগজ নিয়ে একি খ্যাপামো? কাগজ কাটা ত্রিশঙ্কুবাবুর খেয়াল। এই ঘরেই খুঁজলে ওরকম কাগজ কয়েক শ' পাবেন! সব কাগজই কোণ থেকে ঐভাবে কেটে রাখেন উনি।" বলে, ওপাশের ছোট্ট টেবিলে গাদাকরা সাদা কাগজের তাগাড় দেখালেন ডক্টর। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে এক তা কাগজ তুলে নিলে ফাদার মণ্ডল। একই-রকম অসমান আকার।

"ঠিকই বলেছেন," বলল ফাদার মণ্ডল। "কাটা কোণগুলোও রয়েছে ওখানে," বলে এক দুই তিন করে কাগজকাটা কুচো কোণ গুনতে শুরু করে দিলে। বলাবাহুল্য, এ কাণ্ডর পর যে কোনো সুস্থ মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। ডক্টর ভড় শুধু ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

মিনিট দুয়েক পরে কাষ্ঠহাসি হেসে বলল মণ্ডল—"ঠিক আছে। তেইশটা কাগজ কাটা হয়েছে। কোণ কাটা হয়েছে বাইশটার। দেখছি, আর ধৈর্য রাখতে পারছেন না আপনি। চলুন, বাইরে যাওয়া যাক।"

ডক্টর ভড় বললেন—"মিসেস বটব্যালকে খবর দেবে কে? আপনি যদি সে ভার নেন তো চাকরটাকে আমি ফাঁড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করি।"

"যা ভাল মনে করেন", হলঘরের দিকে পা বাড়িয়ে উদাসীন স্বরে বলল ফাদার মণ্ডল।

বাইরে এসে দেখা গেল আর একটি চমকপ্রদ নাটক। কাচঘরের চাইতেও রীতিমত উদ্ভট সে নাটক। দীর্ঘদিন এ মূর্তিতে বন্ধুবর রাঘব হাজরাকে দেখা যায়নি। একদা যে রাঘব হাজরা জনগণের ত্রাস ছিল, আচম্বিতে সেই মারমুখো দাঙ্গাবাজ রাঘব হাজরাকেই সিঁড়ির ওপর ধাপে দেখতে পেল ফাদার মণ্ডল। আর সিঁড়ির গোড়ায় কাঁকরের ওপর দুই ঠ্যাং শূন্যে তুলে চিৎপটাং হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছিল লালুবাবু। একপাটি পাম্পশু ঠিকরে পড়েছে ওপাশের ঘাসজমিতে। রাঘবের পাহারা পছন্দ হয়নি লালুবাবুর। তাই তেরিয়া হয়ে ঘুসি চালিয়ে সটকান দেওয়ার উদ্যোগপর্বেই এই হাল হয়েছে বেচারীর।

শত্রুর ওপর চিতা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে রাঘব হাজরা, এমন সময়ে পেছন থেকে কাঁধের ওপর আলগোছে টোকা দিলে ফাদার মণ্ডল।

“লালুবাবুর সঙ্গে মিটমাট করে নাও ভায়া। মাপ-টাপ দুজনেই দুজনের কাছে চেয়ে নাও। ভদ্রলোককে আটকে রাখার আর দরকার নেই—যেতে দাও ওঁকে।”

সন্দিগ্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বেদনাবিকৃত মুখে পাম্পসুটা কুড়িয়ে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে লালুবাবু এগোলো বাগানের ফটকের দিকে।

“সন্ন্যাসী কথায় ?” সিরিয়াস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মণ্ডল।

ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ডাক্তার। তিনজনেই কুচকাওয়াজ করার ভঙ্গিমায় একসঙ্গে এগিয়ে গেল দীর্ঘশীর্ষ গাছের নিচে ঘাসজমির দিকে। কিছুক্ষণ আগে এইখানেই রহস্যময় ছন্দে দুলছিল নাগার ধ্যানস্থ মূর্তি। কিন্তু এখন সেস্থান শূন্য।

হঠাৎ খেপে গিয়ে মাটির ওপর প্রচণ্ড লাথি মেরে হুংকার দিয়ে উঠলেন ডাক্তার—“বেটা জোচ্চোর বদমাস কোথাকার! এখন বুঝছি একাজ কার।”

“আমি তো ভেবেছিলাম, ম্যাজিক-ফ্যাজিকে বিশ্বাস নেই আপনার”, মৃদুস্বরে বলল ফাদার মণ্ডল।

চোখ পাকিয়ে ডাক্তার বললে—“এখনও নেই। কিন্তু যেদিন থেকে ছাইমাখা ল্যাংটা ভণ্ডটাকে দেখেছি, সেইদিন থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আমার। তন্ত্র-ফন্ত্রের ভেলকি জানাটা ওদের কাছে খুব একটা বিরাট কিছু নয়। এসবই নিচমার্গের ব্যাপার তো।”

রাঘব হাজরা বললে—“আপনার ধারণা সত্য হলেও আমাদের করবার কিছু নেই। কেননা একাজ যে সন্ন্যাসীরই তা প্রমাণ করা কি সম্ভব ? না, সম্ভব নয়। ধ্যানে বসে দূর থেকে ইথারের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তির জোরে একজনকে আত্মহত্যা করানো হয়েছে—এ অভিযোগ নিয়ে তো আর পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়া যায় না।”

কথা বলতে বলতে বাড়ির সামনে ফিরে এসেছিল তিনজনে।

এবার ওপরতলায় ত্রিশঙ্কু-গৃহিণীর কাছে দুঃসংবাদ বহন ক'রে নিয়ে গেল ফাদার মণ্ডল।

নেমে আসার পর একটু ফ্যাকাশে মনে হল ঘনশ্যাম পাদরীকে। মুখচ্ছবি বড়ই করুণ। শোকগম্ভীর। কিন্তু কবির মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে কি কথা শুনে এল ফাদার মণ্ডল, তা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিই জানতে পারল না। কোনোদিনই না। সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরেও নয়।

ডাক্তারের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা কইছিল রাঘব। ফাদার মণ্ডলকে এত তাড়াতাড়ি পুনরাবির্ভূত দেখে যারপর নাই বিস্মিত হল সে। পাদরীর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ইঙ্গিতে ডাক্তারকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন তো?"

"অনেকক্ষণ। মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে যাবে বোধহয়।"

ধীর গম্ভীর স্বরে বলল ঘনশ্যাম পাদরী—"একটা উপকার করবেন? আমার একটা বদখৎ বাতিক আছে। আজকের ঘটনা নিঃসন্দেহে অদ্ভুত। এই ধরনের সৃষ্টিছাড়া গল্প আমি সংগ্রহ করি। জানেন তো, এ জাতের কাহিনী পুলিশের এখ্‌তিয়ারে আসে না। আজকের কেসে নাগা সন্ন্যাসীর যে ভূমিকা, তা নিয়ে তো আর পুলিশের কাছে দরবার করতে যাওয়া যায় না। আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যেও বলতে পারেন—আমি চাই আপনি এই ঘটনার একটা রিপোর্ট আমাকে লিখে দিন। সেয়ানা মানুষ ছাড়া আপনার পেশায় নামযশ করা খুবই কঠিন," স্থির নিষ্পলক চোখে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললে ফাদার। "কেন জানি আমার আজ বার বার মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারের এমন কিছু তথ্য আপনি জানেন, যা উল্লেখ করা দরকার মনে করেন নি। কথা গোপন রাখা আপনার পেশার যেমন বৈশিষ্ট্য, আমারও তাই। রিপোর্টে আপনি যা-ই লিখুন না কেন, জানবেন কাকপক্ষীও

কোনোদিন তা জানতে পারবে না। কিন্তু পুরোটা লেখা চাই।"

মাথা কাৎ করে চিন্তান্বিত মুখে শুনছিলেন ডাক্তার। এবার মুহূর্তের জন্যে পাদরীর চোখের ওপর চোখ রাখলেন। তারপর বললেন—"অল রাইট," বলে কাব্য-মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ফাদার মণ্ডল বলল—"রাঘব, বারান্দার নিচে একটা লম্বা বেঞ্চি দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টিতে না ভিজে চল বসে বসে ধূমপান করা যাক। তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে চাই। কথা না থাকলেও তোমার সঙ্গ আমার চাই।"

ঝোলানো বারান্দার নিচের বেঞ্চিতে জাঁকিয়ে বসল দু'জনে। পরের পান-সিগারেট খাওয়া ঘনশ্যাম পাদরীর অভ্যাস বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই বর্ষণমুখর রাতে রাঘব হাজরার কাছ থেকে নিজেই একটা সিগারেট চেয়ে নিল ফাদার। রিম-ঝিম রিম-ঝিম বৃষ্টি আর ঝড়ো হাহাকারের মধ্যে নিঃশব্দে আধখানা সিগারেট শেষ করে আনল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

তারপরে বলল—"মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, আজকের কেসটা বড় অদ্ভুত।"

"সত্যিই বড় অদ্ভুত", মন্থরকণ্ঠে প্রতিধ্বনি করল রাঘব।

"তুমিও অদ্ভুত বলছ। আমিও অদ্ভুত বলছি। কিন্তু তবু তার উল্টোটাই বুঝছি। আধুনিক মানুষ প্রায়ই দুটো স্বতন্ত্র ধারণাকে গুলিয়ে ফেলে। একটা হল, রহস্য বলতে যা চমক লাগানো। আর একটা হল, রহস্য বলতে যা জটিল। অর্থাৎ অর্ধেকটা হল মির‍্যাকল্ বা দৈব ঘটনার ব্যাপার। মির‍্যাক্‌ল্ চমকে দেয় বটে, কিন্তু তা সরল। সরল কেননা তা মির‍্যাক্‌ল্। প্রকৃতি বা মানুষের ইচ্ছার মাধ্যমে না এসে সরাসরি ঈশ্বর (বা শয়তানের) কাছ থেকে নেমে আসে যে শক্তি, তাই হল মির‍্যাক্‌ল। তোমার মতে,

আজকের ঘটনা—মির‍্যাক্‌ল। এবং চমকপ্রদ। কেননা, এ হল, তন্ত্রমন্ত্র-জানা এক দুষ্ট নাগার কুকীর্তি। ব্যাপারটায় ঈশ্বর বা শয়তানের হাত নেই তা অবশ্য আমি বলতে চাই না। কেননা, মানুষ যা-ই করুক না কেন, তার অন্তরের গহন কন্দরে এই দুইয়ের প্রভাব থাকবেই। কিন্তু বর্তমান ঘটনায় আমার বক্তব্য হল এই ঃ তোমার মতানুসারে এ ব্যাপার যদি নিছক ম্যাজিকই হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু এ ঘটনা রহস্যজনক নয়—কেননা, তা জটিল নয়। মির‍্যাক্‌ল্ বলতে যা বোঝায় তাতে রহস্যের পরিমাণ বেশী থাকলেও ধরন-ধারনটা সরল হয়। কিন্তু এ কেসের ধরন-ধারন সরল তো নয়—বরং ঠিক তার উল্টো।”

কিছুক্ষণের জন্যে বেগ কমে ছিল ঝড়ের—আবার তা গোঁ-গোঁ শব্দে ক্ষেপে উঠল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাথর গড়িয়ে যাওয়ার মত গুড়-গুড় মেঘের গর্জন। সিগারেটের ছাই ফেলে আবার শুরু করল ফাদার মণ্ডল ঃ

“এ ঘটনায় এমন একটা দোমড়ানো মোচড়ানো, কুৎসিত কদাকার, জটিল প্রকৃতি রয়েছে যা আকাশ বা পাতালের সিধে বিদ্যুতের মত নয়। শামুকের বক্রগতির মত মানুষও যখন বক্রগতি আশ্রয় করে, আমি তা বুঝতে পারি ”

বিশাল চক্ষুতে ঝলসে উঠল সাদা বিদ্যুৎ। পরক্ষণেই আকাশের চোখ বন্ধ হয়ে যেতেই আবার শুরু করল ঘনশ্যাম।

“ঘোর-প্যাঁচ এ কেসে বিস্তর রয়েছে। সব চাইতে কুটিল হল কাগজের আকারটা। যে ছোরায় মারা গেলেন কবি, তার চাইতেও কুটিল এই কাগজ আর তার আকার।”

“কোন কাগজটা? যে কাগজে আত্মহত্যা স্বীকার করে গেছেন ত্রিশঙ্কুবাবু?” শুধোলো রাঘব।

“যে কাগজে ত্রিশঙ্কুবাবু লিখেছিলেন, ‘মরছি নিজের হাতে’।

বন্ধু, কাগজটার আকার যে রকম হওয়া উচিত, সে রকম নয়। রীতিমত বেয়াড়া আকার। এই ক্রুর দুনিয়ায় যত রকম বেয়াড়া আকার আমি দেখেছি, তাদেরই মত।”

রাঘব বললে—“কাগজটার কোণটা কেবল কাঁচি দিয়ে কাটা ছিল। শুনলাম, ত্রিশঙ্কুবাবুর সব কাগজই তো ঐভাবে কাটা।”

“সেইটাই তো দারুণ অদ্ভুত, দারুণ খারাপ—অন্তত আমার রুচি, আমার কল্পনা তাই বলে। রাঘব, তোমার বন্ধু ত্রিশঙ্কু—ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিক—ছিটগ্রস্ত ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর শিল্পরুচি ছিল। প্রকৃত শিল্পীর মতই ছিল তাঁর কল্পনা। এ বাড়ির সর্বত্র তাঁর রুচির নিদর্শন আমরা পেয়েছি। তাঁর কনজারভেটরী দেখে নূরজাহানের বিখ্যাত ক’টি লাইন মনে পড়েছে ঃ

‘অগর ফিরদৌস বরুয়ে জামিনস্ত
হামিনস্ত হামিনস্ত হামিনস্ত।’

‘যদি পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে তা এখানে, তা এখানে, তা এখানে’। কবির হাতের লেখা পড়তে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তা স্পষ্ট আর সুন্দর। যা বলছি, তা প্রমাণ করতে পারব না আমি, প্রমাণ কিছুই করতে পারব না। কিন্তু আমার সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের শেষ বিন্দু দিয়েও বলছি, কাগজের টুকরোটাকে ঐ রকম জঘন্যভাবে তিনি কখনও কাটতে পারেন না—পারেন না—পারেন না। জোড়াতালি দেওয়ার জন্যে বা অন্য কিছু করার জন্যে কাগজের টুকরোর দরকার হলে সম্পূর্ণ অন্যভাবেই কাঁচি চালাতেন তিনি—এ রকম অশিল্পীর মত খাবল দিতেন না। কাগজের আকারটা তোমার মনে পড়ছে কি? অত্যন্ত জঘন্য আকার। নোংরা আকার। বেয়াড়া আকার। এই রকম। মনে পড়ছে?”

বলতে বলতে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে দ্রুতবেগে অন্ধকারের বুকে মিশরীয় অক্ষর-চিত্রর মত জটিল হিরোগ্লিফিক আঁকল ফাদার। দুর্বোধ্য অক্ষর-চিত্র, ফাদারের মতে যার অর্থ ক্রূর, কুটিল ও করাল।

সিগারেটটি আবার যথাস্থানে ফিরে যেতেই রাঘব জিজ্ঞেস করল, "ধরুন, ত্রিশঙ্কুর বদলে আর কেউ কাঁচি চালিয়েছে। কিন্তু সেই বেয়াড়া আকারের কাগজ কেটে ত্রিশঙ্কুকে সে আত্মহত্যা করাতে যাবে কেন?"

সিগারেট মুখে দিয়ে পেছনে হেলে পড়ে বারান্দার তলা দেখছিল ঘনশ্যাম মণ্ডল। সেইভাবেই এখন জবাব দিলে—"ত্রিশঙ্কুবাবু আত্মহত্যা করেননি।"

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল রাঘব হাজরা।

"কি বাজে বকছেন! তাহলে আত্মহত্যার কথা সে স্বীকার করতে গেল কেন?"

আবার ঝুঁকে বসল ফাদার মণ্ডল। হাঁটুর ওপর কনুই রেখে তাকাল ভিজে মাটির দিকে। বললে মৃদু অথচ সুস্পষ্ট স্বরে—"আত্মহত্যার কথা উনি স্বীকার করেননি।"

জ্বলন্ত সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে রাঘব।

"আপনি বলতে চান, লেখাটা নকল?"

"না। লেখাটা ত্রিশঙ্কুবাবুরই।"

তপ্ত স্বরে রাঘব বললে—"পথে আসুন। তাহলে, ত্রিশঙ্কু লিখল 'মরছি নিজের হাতে'—লিখল নিজের হাতে একটুকরো সাদা কাগজের ওপর।"

"বেয়াড়া আকারের কাগজ", প্রশান্ত কণ্ঠে বললে পাদরী।

"গোল্লায় যাক আপনার বেয়াড়া আকার!" হাঁটুর ওপর থাপ্পড় মেরে চেঁচিয়ে ওঠে রাঘব। "আকারের সঙ্গে আত্মহত্যার কি সম্পর্ক?"

"তেইশটা কোণকাটা কাগজ পেয়েছি। কিন্তু কাটা কোণ পেয়েছি মাত্র বাইশটা। হারিয়ে যাওয়া কোণটা নিশ্চয় যে কাগজে আত্মহত্যা স্বীকার করা হয়েছে তারই। কুচো কোণটা তাহলে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে ইচ্ছে করেই। কিছু বুঝলে ?"

ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে ওঠে রাঘবের মুখ। বলে—"অর্থাৎ আরও কিছু লেখা ছিল কাগজটায়—তাই তো ? সেইটুকুই কাঁচি দিয়ে পাশ থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। ত্রিশঙ্কু হয়ত লিখেছিল—সবাই বলবে 'মরছি নিজের হাতে'। অথবা—'বিশ্বাস করো না তোমরা যে আমি—"

"উহুঁ। অত বড় নয়। কুচোটা চওড়ায় আধ ইঞ্চি নয়। ওইটুকু জায়গায় একটা শব্দই লেখা যায় না—একাধিক শব্দ লেখা একেবারেই সম্ভব নয়। 'কমা'র চাইতে একটু বড় কিছু মাথায় আসছে কি ? খুনে লোকটার কুকীর্তি ফাঁস করার পক্ষে ঐটুকুই মোক্ষম প্রমাণ—তাই তা নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। কি ? মাথায় কিছু এল ?"

"'কমা'র চাইতে একটু বড় ? নাঃ বুঝতেই পারছি না কি বলছেন।"

"যদি বলি কোটেসন চিহ্ন ?" বলে, খসে পড়া তারার মতই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে পাদরী।

বাকরহিত হয়ে বসে রইল রাঘব হাজরা।

ফাদার মণ্ডল বলল—"ত্রিশঙ্কু বটব্যাল অলৌকিক উদ্ভট কবিতা লিখতে ভালবাসতেন। তাঁর বর্তমান কবিতার বিষয়বস্তু ছিল সম্মোহন আর অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। ময়ূর···"

ঠিক এই মুহূর্তে ঝট করে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। একটা লম্বা লেফাপা পাদরী মণ্ডলের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—"যে ডকুমেণ্টটা চেয়েছিলেন আপনি। চললাম। নমস্কার।"

"নমস্কার" বলল ফাদার মণ্ডল। ডক্টর ভড় ততক্ষণে বৃষ্টির মধ্যে

ব্যাগ হাতে বাগানের ফটকের দিকে রওনা হয়ে পড়েছেন। সদর দরজা খোলা ছিলো। একফালি আলো এসে পড়েছিল বাইরে। সেই আলোয় লেফাপা ছিঁড়ে পড়তে লাগল ফাদার মণ্ডল :

"প্রিয় ফাদার মণ্ডল,

"আপনি হয় ম্যাজিশিয়ান, না হয় জ্যোতিষী!"

"দুটোর কোনোটাই যদি না হন তো বলিহারি যাই—আপনার চোখকে! ইস্পাতের ছুঁচও এত ভেতরে ঢুকতে পারে না! সাধারণ মানুষের চোখ তো এরকম অন্তর্ভেদী হয় না! তবে কি সম্মোহন, মন্ত্র ইত্যাদির গাল-গল্পই বিশ্বাস করতে হবে আমাকে!

"ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতিতে বিশ্বাস করে এসেছি আমি। শরীরের যা ধর্ম যা প্রবৃত্তি, তাকেই মেনে নিয়েছি। সে প্রবৃত্তি নীতির ভেতরেই হোক কি বাইরেই হোক—তা নিয়ে অযথা মাথা ঘামাইনি। ডাক্তার হওয়ার অনেক আগেই ইঁদুর আর মাকড়শা পুষতাম। ভাবতাম পশুদের মতই ছিমছাম সহজ সরল হতে পারলেই জীবনের অনেক সমস্যার অবসান ঘটবে। কিন্তু আজ আমার সেই আজন্ম ধারণার ভিত্তি নড়ে উঠেছে। প্রকৃতিবিশ্বাসী ছিলাম; কিন্তু মনে হচ্ছে প্রকৃতিও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে। আমি আজ অসুস্থ। সত্যিই অসুস্থ।

"ত্রিশঙ্কুর বউকে আমি ভালবাসতাম। ভালবাসায় কি কোন পাপ আছে? নেই। জৈবিক প্রেরণায় ভালবেসেছি—'নেচার'-এর তাড়নায় ভালবেসেছি। ভেবেছিলাম, আমার নিখাদ ভালোবাসায় সেও সুখী হবে। ভালোবাসার প্রতিদান ভালোবাসাতেই পাবো। আমার মত ছিমছাম প্রাণীর সঙ্গে ঘর করে সে শান্তি পাবে—যে শান্তি আজও সে অর্ধ উন্মাদ ত্রিশঙ্কুর কাছে পায়নি। কাজেই ভালবেসে আমি কোনো অন্যায় করিনি। বিজ্ঞানীর পূজারী আমি। বৈজ্ঞানিকের মতই বাস্তবকে আশ্রয় করেছিলাম। আমাকে পেলে ত্রিশঙ্কুর বউও সুখী হত।

“আমার পেশাগত ক্ষমতার জোরে ত্রিশঙ্কুকে যখন খুশী খুন করার স্বাধীনতা আমার ছিল। তাতে দুনিয়ার অনেকের তো বটেই ত্রিশঙ্কুর নিজেরও কল্যাণ হত। কিন্তু নিজেকে খামাকো মেরে ফেলারও কোনো সদিচ্ছা আমার ছিল না। তাই ঠিক করেছিলাম সুযোগ না আসা পর্যন্ত ত্রিশঙ্কু-কীটের গায়ে আঁচড়টিও কাটব না আমি। আজ বিকেলেই এল সেই সুযোগ।

“আজ বিকেলে সবশুদ্ধ তিনবার কাব্যমন্দিরে ঢুকেছি আমি। প্রথমবার যখন গেলাম, তখন সদ্য আরম্ভ করা কবিতা নিয়ে আমার কানের পোকা বার করার উপক্রম করল ত্রিশঙ্কু। কবিতার নাম ‘অভিশপ্ত ময়ূরবাহন’। ময়ূরবাহন তার হিরোর নাম। হিরোর সুন্দরী বউ এক নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রঙ্গ-পরিহাস করেছিল হিরোরই নির্দেশে। শেষে নাগার অভিশাপে ময়ূরবাহন পত্নীকে চিরতরে হারায়। তারপর প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে বহু দূর থেকে ময়ূরকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে সন্ন্যাসী। মরবার ঠিক আগে বন্ধুর কানে ফিসফিস করে সে বলে যায়—‘মরছি নিজের হাতে, তবু আমি নিহত!’ আমার কপাল ভালো। এরকম সুযোগ হাজারে একটা পাওয়া যায় না। কেন-না, শেষ লাইনটা লেখা হয়েছিল নতুন এক তা কাগজের একদম ডগায়। কবিতাটা শোনার পর একটা ভয়ংকর সুযোগের আনন্দে নেশাখোরের মতই মূহ্যমান হয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

“সারা বাড়িটা চক্কর দিয়ে আসার সময় আরোও দুটো ঘটনা ঘটল। ফলে, আরও সহজ হয়ে উঠল আমার পরিকল্পনা। প্রথম, একটা ছোরা কুড়িয়ে পেলেন আপনি। ছোরার বীভৎস গড়ন দেখে কদাকার সন্ন্যাসীর বলেই মনে হল। দ্বিতীয়, সন্ন্যাসীর ছাইমাখা চেহারা দেখার পর থেকেই মনটা বিরূপ হয়ে উঠল আপনার। প্রথম সুযোগেই ছোরাটা পকেটস্থ করলাম। ফিরে এলাম কাব্যমন্দিরে। দরজা বন্ধ করে ঘুমের ওষুধ দিলাম ত্রিশঙ্কুকে।

শ্যালক লালুবাবুর সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা, তার আর্জি শুনে জবাব দেওয়ারও ইচ্ছে ছিল না ত্রিশঙ্কুর। কিন্তু আমিই জেদাজেদি করে রাজী করলাম। দ্বিতীয়বার আমি ঘরে থাকার সময়ে ত্রিশঙ্কু যে জীবিত ছিল, তার সাক্ষী রাখলাম আপনাদেরই। ত্রিশঙ্কুকে রাজী করিয়ে কাব্যমন্দিরের মধ্যে দিয়ে দরজা খুলতে আসার সময়ে অত্যন্ত দ্রুত হাতে প্ল্যানমাফিক কয়েকটা কাজ করে নিলাম। বড় বড় অপারেশন করার সময়ে বিদ্যুৎবেগে আঙুল না কাঁপিয়ে হাত চালানোর অভ্যেস আমাদের থাকে। কাজেই কাব্যমন্দিরে টেবিলের ওপর রাখা ত্রিশঙ্কুর কবিতার আগের কটা পাতা পকেটস্থ করলাম। শেষ পাতার ওপরে লেখা ছিল ঃ

মরছি নিজের হাতে, তবুও আমি নিহত !”

“দেখলাম ডানদিকের কোটেসন মার্কাটা বাদ দেওয়া দরকার। তাই কাঁচি চালিয়ে তা বাদ দিলাম—কুচোটা কোথায় পড়ল, সে খেয়াল রইল না তাড়াতাড়িতে। সব কটা কাগজই যাতে একরকম দেখতে হয়, তাই দিস্তের বাকী কটা কাগজেরও কোণ কেটে দিলাম। পুরো ষাট সেকেণ্ডও লাগল না এই কটা কাজ সারতে। তারপরেই দরজা খুলে ত্রিশঙ্কুর গলা শোনালাম আপনাদের। দরজা বন্ধ করার সময়ে দেখে নিলাম টেবিলের ওপরেই রয়েছে ত্রিশঙ্কুর নিজের হাতে লেখা আত্মহত্যার স্বীকৃতি—অথচ ত্রিশঙ্কু তখনও জীবিত, ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে ওপাশের কনজারভেটরীতে।

“শেষবারই রীতিমত বেপরোয়া হতে হয়েছিল আমায়। কি করেছিলাম, তা নিশ্চয় অনুমান করে ফেলেছেন এতক্ষণে। ত্রিশঙ্কুকে মরা অবস্থায় দেখেছি, এই ভান করে তীরের মত বেগে ঢুকে পড়লাম কাচঘরে। কাগজটা আপনার হাতে তুলে দিয়ে ইচ্ছে করেই আটকে রাখলাম আপনাকে—সেই সুযোগে ছুরি-কাঁচি চালানোর চটপটে হাতে খুন করলাম ত্রিশঙ্কুকে—আপনি

তখন আত্মহত্যার স্বীকৃতি পড়ছেন। ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্নের মত ছিল ত্রিশঙ্কু—গভীর ঘুম নয়। ওরই মুঠোয় ছোরাটা ধরিয়ে দিয়ে ঠেলে দিলাম বুকের বাঁদিকে। ফলা বাঁকা থাকলেও ঠিক কোথায় বসালে হৃদপিণ্ড ফুটো হয়ে যাবে, সে জ্ঞান আমার আছে। জানি না, এটুকু হিসেব আপনার চোখে ধরা পড়েছে কিনা।

"নির্বিঘ্নে খুনটা সুসম্পন্ন করবার পর ঘটল সেই অসাধারণ অঘটন। প্রকৃতি পরিত্যাগ করে গেল আমাকে। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। জঘন্য ক্রাইম করে মানুষ যে রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে—আমরাও দেহমনের সেই অবস্থা হল। মাথাটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে; আপনার কাছে মন হাল্কা করে বেপরোয়া আনন্দ পাচ্ছি। যতই ভাবছি, আমার এই কুকাজের শ্রোতা অন্তত আরও একজন আছে, আর এ কাণ্ডের পর বিয়ে করে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়—ততই একটা অদ্ভুত শান্তিতে মনটা ভরে উঠছে। এ কি হল আমার?……উন্মত্ততা?……অনুতাপও হতে পারে……আর লিখতে পারছি না।

বিনয়ভূষণ ভড়"

সন্তর্পণে কাগজটা ভাঁজ করে বুক-পকেটে গুঁজে রাখল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। ঠিক তখনি অন্ধকারের দানোর জ্বলন্ত চোখের মত একজোড়া হেডলাইট জ্বালিয়ে পুলিশের জীপ এসে সশব্দে ব্রেক কষলো বাগানের ফটকের সামনে।

আমি স্তব্ধ হতেই জোড়াজোড়া বিমুগ্ধ দৃষ্টির নীরব প্রশংসা বৃষ্টি শুরু হল ফাদার ঘনশ্যামের ওপর। ধরণী-দ্বিধা হও জাতীয় মুখ করে অধোবদনে বসে রইল ফাদার।

গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন চিত্তদা—"ফাদার, আপনার সব গল্পই দেখছি সাধারণ মানুষ নিয়ে। রাজা রাজরার কাহিনী বুঝি আপনার ঝুলিতে নেই।"

চকিতে চোখ তুলল ফাদার। বলল—"তাও আছে।" বলেই অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল আমার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—"প্রিন্স মেঘবাহনের পাপাচার।"

লোমহর্ষক সেই উপাখ্যান আরম্ভ হল তৎক্ষণাৎ।

পূজোর পর কিছুদিন ছুটি নিল রাঘব হাজরা। আপিসে তালা ঝুলিয়ে পা বাড়াল কলকাতার বাইরে। পা বাড়াল বললে ঠিক বলা হয় না, ভেসে পড়ল। অর্থাৎ ক্যানিং থেকে ছোট একটা নৌকো বেশ কিছুদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে রওনা হল সুন্দরবন অঞ্চলে।

সরু সরু নালার মধ্যে দিয়ে ভেসে চলল রাঘবের নৌকো। এত সরু নালা যে দূর থেকে দেখে মনে হল যেন মাঠ ভেদ করে ডাঙার ওপর দিয়ে চলেছে এক আজব ম্যাজিক বোট।

সরু নদী দিয়ে যেতে হবে বলেই ছোট্ট নৌকো ভাড়া করেছিল রাঘব। এত ছোট যে দুজনের বেশী তিনজন যাত্রী হলেই নৌকোয় চড়ার সব আনন্দটাই মাঠে মারা যায়। দুজন বসবার পর জিনিস-পত্র রাখবার জায়গা থাকে খুবই অল্প। এত অল্প যে নিতান্ত দরকারী টুকিটাকি ছাড়া আর কিছু রাখার উপায় থাকে না।

কাজেই রাঘব হাজরার বিশেষ ফিলজফি অনুসারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বলতে মোটমাট চারটি বস্তু স্থান পেয়েছিল নৌকা গহ্বরে। বায়ুনিরোধক টিনভর্তি মাছ—ক্ষিদে পেলে খাওয়ার জন্যে; গুলিভর্তি রাইফেল—আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লড়াই করার জন্যে; এক বোতল ব্র্যাণ্ডি—অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেলে জ্ঞান ফিরোনোর জন্যে; আর একজন পাদরী—ঈশ্বর-টিশ্বর নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার জন্যে।

এহেন হাল্কা লাগেজ নিয়ে ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মত দুলতে দুলতে চলেছিল রাঘব আর তার নৌকো। দাঁড় বইতে বইতে শিস দিচ্ছিল খুশী মনে, কখনো-সখনো আনাচে-কানাচে ছিপ ফেলে

মাছ ধরছিল ভুরি-ভোজনের জন্য, আবার মধ্যে মধ্যে ক্যামেরা বার করে পটাপট ছবি তুলছিল আশপাশের অপরূপ নিসর্গ দৃশ্যের !

খাঁটি ফিলজফারের মতই কোনো উদ্দেশ্য না নিয়েই ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়েছে রাঘব। কিন্তু খাঁটি ফিলজফারের মতই একটা অজুহাত ছিল। আধা উদ্দেশ্যের মতই একটা উদ্দেশ্য ছিল রাঘবের, যে উদ্দেশ্য সার্থক হলে উথলে উঠত ছুটির আনন্দ ; কিন্তু ব্যর্থ হলে ক্ষতি হত না বিন্দুমাত্র।

অনেক বছর আগের ঘটনা। দুর্দান্ত দস্যু হিসেবে তখন রাঘব হাজরার দারুণ নামডাক। চারদিক থেকে অজস্র চিঠিপত্র পৌঁছোতো তার নামে। কোনো চিঠিতে থাকত অভিনন্দন, কোনোটাতে গালিগালাজ, আবার কোনোটাতে প্রেমনিবেদন। কিন্তু একটি চিঠি আজও ভুলতে পারেনি রাঘব। চিঠি না বলে তাকে ভিজিটিং কার্ডই বলা উচিত। খামের মধ্যে শুধু একটা ভিজিটিং কার্ড। আর কিছু নয়। পেছনে সবুজ কালি দিয়ে হিন্দীতে লেখা ঃ

"যদি কোনোদিন অবসর গ্রহণ করেন এবং সম্মানীয় জীবন শুরু করেন, তাহলে চলে আসুন—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আলাপ করতে চাই এই কারণে যে আমার সম-সাময়িক যুগের হেন অতিমানব নেই যার সঙ্গে আলাপ করিনি। একজন ডিটেকটিভকে দিয়ে আর একজন ডিটেকটিভকে গ্রেপ্তার করানোর যে চমকপ্রদ কৌশল আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছে—তা অপরাধের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" কার্ডের অপর দিকে উঁচু উঁচু সোনালী হরফে লেখা ছিল ঃ "প্রিন্স মেঘবাহন, বাঁশ বাংলো, বাঁশ দ্বীপ, সুন্দরবন"।

প্রিন্স নিয়ে তখন মাথা ঘামানোর সময় ছিল না রাঘবের। তবে খোঁজ-খবর নিয়ে প্রিন্স মেঘবাহনের বিচিত্র কীর্তিকলাপ শুনে

চমৎকৃত হয়েছিল সে। সুন্দরবনে রাজ্যপাট বসালেও প্রিন্সের আদি রাজত্ব এদেশে নয়—সুদূর মধ্যপ্রদেশে। সৌখীন আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রিন্স মেঘবাহনকে এক ডাকেই সেদেশে সবাই চেনে। যৌবনে অভিজাত ঘরের এক বধূকে নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন প্রিন্স। ফলে, হইচই পড়ে যায় বনেদীমহলে ; এহেন চাঞ্চল্যকর ইলোপ-কাহিনীও কালক্রমে সবাই ভুলে যেত। কিন্তু এরপরেই যে ট্রাজেডী ঘটল, তা ভোলবার নয়। নিদারুণ কেচ্ছায় চারিদিকে ঢিঢি পড়ে যেতে মেয়েটির স্বামী পাহাড়ের চূড়ো থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। প্রিন্স ভারত ছেড়ে কিছুকাল প্যারিসে রইলেন। তারপর শুরু হল পৃথিবী পর্যটন। একনাগাড়ে দেশে দেশে ঘুরেছেন—বেশীদিন কোথাও থাকতে পারেননি।

দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে গোয়েন্দা হওয়ার পর রাঘব ভাবল, এবার দেখে আসা যাক প্রিন্স মেঘবাহনের মূর্তি। বাঁশদ্বীপের মত নগণ্য দ্বীপকে সুন্দরবন অঞ্চলে খুঁজে বার করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু দমবার পাত্র নয় রাঘব। সুন্দরবনের নদী-নালায় বেড়াতে বেড়াতে বাঁশদ্বীপের সন্ধান পাওয়া যায় ভাল, না হলে কোনো ক্ষতি নেই—এই অভিলাষ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

সুন্দরবনের খাল, নালা, নদী পথের সঙ্গে রাঘব হাজরার পরিচয় বহুদিনের। তাই স্বচ্ছন্দগতিতে তরতর করে বয়ে চলল তার নৌকো। ছুপাশের সুন্দরী গাছের রক্তবর্ণ কাঠ, আর পশুর, গর্জন, হেন্তালবনের ওপর উদাস দৃষ্টি মেলে সজীব বস্তার মত বসে রইল পাদরী ঘনশ্যাম মণ্ডল। এক জায়গায় দেখা গেল তীরের কাছে জলের মধ্যে ওপর দিক করে পোঁতা রয়েছে একটা দাঁড়। ডগায় বাঁধা এক টুকরো শাদা কাপড়ের একটা নিশান। নিশানের এক কোণে ছোট্ট একটা পুঁটলি।

শিশুর মত কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল ফাদার মণ্ডল "রাঘব, পুঁটলির মধ্যে কী ?"

"চাল।"

"কেন ?"

"ওখানে মাঝিমাল্লা কেউ বাঘের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। তারই স্মারকচিহ্ন ঐ নিশান আর পুঁটলি," এমনভাবে বলল রাঘব যেন এ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

পাদরীর নির্বোধ চাহনির মধ্যে ভয়ডরের কোনো চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল না। সুন্দরবনের কেঁদো আর নরখাদক কুমীরের বিপদটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেও মনে হল না।

রাঘব আবার বললে—"সুন্দরবনের সর্বত্র নদীনালায় এরকম আড়ম্বরহীন স্মারক চিহ্ন আপনি দেখতে পাবেন।"

কিন্তু এ বিষয় নিয়ে পাদরীর আর আগ্রহ বোধহয় ছিল না। তাই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল অপর পারে দুজন কাঠুরিয়ার দিকে। সামনে বসে মোবরা গাজীর চেলা এক ফকির বৃত্ত এঁকে বাঘ তাড়ানো মন্ত্র আউড়াচ্ছে।

নৌকো থেকে হেঁকে উঠল রাঘব। জানতে চাইলে বাঁশবাংলো বা বাঁশদ্বীপ কোনদিকে। মন্ত্র আউড়াতে আউড়াতে হাতের ইঙ্গিতে নালার সামনের বাঁকটা শুধু দেখিয়ে দিলে ফকির।

আরও একটু যাওয়ার পরেই বাঁ পাশে পড়ল ছোট্ট একটা গ্রাম। এপাশে-ওপাশে গোলপাতা আর হোগলার বন। কুঁড়েঘরগুলোও ছাওয়া হয়েছে গোলপাতা দিয়ে। হোগলা আর মাটির দেওয়াল।

আরও একটা বাঁক পেরিয়ে এল নৌকো। বিচিত্র অরণ্য দেখেও বোধকরি তাক লেগে গেছিল ফাদার ঘনশ্যামের। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল দুপাশের বনঝাউ, গাব, গরাণ আর গেঁয়ো গাছের দিকে।

আচমকা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েই নৌকো এসে পড়ল ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত একটা হ্রদের মধ্যে। প্রশান্ত টলটলে জল। কাকচক্ষু দীঘির মতই অপরূপ।

হ্রদের ঠিক মাঝখানে একটা লম্বাটে দ্বীপ—অনেকটা ডিমের মত। দ্বীপের ওপর আশ্চর্য ডিজাইনের একটা লম্বাটে বাংলো আগাগোড়া বাঁশ আর বেত দিয়ে তৈরী। দেওয়ালের খাড়াই বাঁশগুলোর রং ফিকে হলদে, ছাদের ঢালু বাঁশে গাঢ় লাল আর বাদামীর বাহারি কারুকাজ, জানলায়-জানলায় উজ্জ্বল সবুজের মানানসই ফ্রেম। সব মিলিয়ে অপূর্ব।

কিনারার বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে দামাল হাওয়ার সঙ্গীতে সুর মিলিয়ে সোল্লাসে বললে রাঘব—“এই তো বাঁশদ্বীপ, ঐ তো বাঁশবাংলো!”

ফিস-ফিস করে বললে পাদরী ঘনশ্যাম—“হ্যাঁ, বাঁশবাংলো আর বাঁশদ্বীপই বটে। কিন্তু শান্তি নেই, শান্তি নেই, শান্তি নেই এখানেও!”

প্রলাপে কর্ণপাত না করে বাঁশঝাড়ের কিনারায় নৌকো ভিড়ালো রাঘব। দ্বীপে ওঠবার একটি মাত্র ঘাট বাঁশ দিয়ে বাঁধানো এবং তা বাঁশবনেরই গাঘেঁসে। হাওয়ায় নুয়ে পড়েছিল বাঁশগুলো। অদ্ভুত খটাখট খটাখট শব্দের সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। খুঁটিতে নৌকোটা বেঁধে এক লাফে বাঁশঘাটে উঠে পড়ল রাঘব—পেছনে পেছনে ফাদার মণ্ডল।

বাঁশবাংলোর পেছন দিকটা জলের দিকে—সামনের দিকটা দ্বীপের ভেতর দিকে। বাংলোর সদর দরজা সেই দিকেই। দরজার সামনে সাজানো বাগান। বাঁশঘাট থেকে নুড়িবিছানো একটা রাস্তা উঠে গেছে—বাংলোর তিনদিকে বেড় দিয়ে সে রাস্তা পৌঁচেছে সদর দরজায়। পথ দিয়ে যেতে যেতে তিনদিকের তিন রকমের তিনটি জানলা দিয়ে একই ঘরে একই দৃশ্য দেখতে পেল

দুই বন্ধু। সুদীর্ঘ টেবিলে থরে থরে সাজানো বিস্তর লোভনীয় খাবার। ঘরটিও বেশ লম্বা। পালিশকরা কাঠের ঝকঝকে প্যানেল এবং এন্তার আয়না। তিনদিকের তিন জানলা দিয়ে আলো ঝলমলে ঘরের দৃশ্য দেখতে দেখতে সদর দরজায় পৌঁছানোর পর দেখা গেল আর একটি দৃশ্য। দরজার দুপাশে দুটো পেল্লায় ফুলদানি। বুকসমান উঁচু। ঘন নীলের ওপর টুকটুকে লাল রঙে আঁকা চীনের দত্যিদানো আর ড্রাগন মূর্তি।

বিকট মূর্তিগুলোর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল খানদানী চেহারার একজন ভদ্রলোক। বনেদী মহলে নায়েব গোমস্তাদের চেহারা যে রকম হয়—সেই রকমই ছিমছাম চেহারা তার। বাঁশের মতই পাতলা লম্বা। ধূসর মাথা। চোখ-মুখ নির্ভাষ এবং উদাসীন। প্রিন্স মেঘবাহন এখন বাড়ি নেই। তবে এখুনি এসে যাবেন। তাঁর অতিথিদের জন্যে বাংলো সবসময়ে প্রস্তুত। কিন্তু সবুজ কালিতে লেখা আইভরি কার্ডটা দেখেই ঈষৎ চমকে উঠল ভদ্রলোক। নির্বিকার মুখে দেখা গেল প্রাণের স্ফুলিঙ্গ, পার্চমেন্টের মত ভাবরেখাহীন দমেযাওয়া মুখে জ্বলে উঠল কৌতূহলের রোশনাই, মাথা নিচু করে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে—"হিজ হাইনেস যে কোনো মুহূর্তেই এসে পড়বেন। আপনারা চলে গেলে উনি দুঃখিত হবেন। আমার ওপর ঢালাও অর্ডার আছে, বন্ধু-বান্ধব এলে যেন না খাইয়ে ছাড়া না হয়। আপনারা দয়া করে ভেতরে আসুন।"

অনেকদিন পরে ছোটখাট অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে বেশ উল্লসিত হয়ে ওঠে রাঘব হাজরা। প্রৌঢ়র পিছু পিছু দুই বন্ধু এসে দাঁড়ায় সুসজ্জিত আলোকিত ঘরের মধ্যে।

আয়না ছাড়া ঘরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। আয়নার মতই আয়না। প্রতিটি জানলার এদিকে-ওদিকে সাজানো সারি-সারি বিস্তর দর্পণ। মানুষ-সমান লম্বা। নিচু নিচু টানা জানলার পাশেই এত আয়না থাকায় ঘরটাকে ঘর বলে মনে হয়

না; এ যেন উঠোনে বসে খানাপিনা করা। বিচিত্র আয়না সজ্জার জন্যেই ঘরের সমস্ত পরিবেশটাই পালটে গেছে।

এ ঘরে গাম্ভীর্য নেই—আছে শুধু হাল্কা আমেজ। এককোণে শুধু ঝুলছিল গোটা তুয়েক পার্থিব ছবি। সতেজ চেহারার একজন তরুণের একটা ফোটোগ্রাফ। পরণে ইউনিফর্ম। আর একটি ছবিতে দ্রুত হাতের একটা স্কেচ; তুটি ছোট ছেলের ছবি, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। সৈনিকমূর্তি প্রিন্স মেঘবাহন কিনা, রাঘব হাজরার এ প্রশ্নের উত্তরে প্রৌঢ় সেক্রেটারী সংক্ষেপে জানালে ছবিটা প্রিন্সের ছোট ভাই ক্যাপ্টেন ভার্গব মেঘবাহনের। বলে, মুখে কুলুপ এঁটে দিল ভদ্রলোক। পার্চমেণ্টের মতই আবার শুকনো নীরস হয়ে উঠল তার রসনা।

ভুরিভোজনের পর কফি পান করে বাগান দেখে এল অতিথিরা। লাইব্রেরী দেখেও চমৎকৃত হল। সবশেষে আলাপ হল ম্যাডোনার মত প্রশান্ত চেহারার এক অপরূপ সুন্দরীর সঙ্গে। ভদ্রমহিলার রূপ দেখলে শুধু চোখই জুড়োয় না, সম্ভ্রমবোধে মনটাও ভরে ওঠে। প্রিন্স মেঘবাহনের আদিরাজ্য থেকে এসেছে শুধু এই তুজনই—রূপসী মহিলা এবং শ্বেতশুভ্র প্রৌঢ়। মহিলার নাম রেবতী। বাঁশ বাংলোর যাবতীয় ঘরকন্নার দায়িত্ব তার ওপর। প্রৌঢ়র নাম মিস্টার ভৈরব। হাবভাব কথাবার্তা অত্যন্ত মার্জিত এবং কেতাতুরস্ত—রাজবংশের উপযুক্ত সেক্রেটারীই বটে। এরা ছাড়া, বাঁশবাংলোর যাবতীয় চাকর-বাকর এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা।

বাঁশবাংলোর সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য এখানকার বিষাদ। বাঁশদ্বীপের অণুতে পরমাণুতে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে সে বিষাদ।

এখানকার ঘরে ঘরে আছে দিনের আলো। কিন্তু সে আলো যেন মৃত্যুর মত নিস্তেজ। কাঁচের বাসনে ঠোকাঠুকির রিন-ঝিন সঙ্গীত, টুকরো টুকরো কথাবার্তা, চাকরবাকরদের চলাফেরার শব্দ ছাপিয়ে

মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছে নদীর কলকলানি—কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে মনমরা সুর।

এক-একটি ঘণ্টা এক-একটি দিনের মতই সুদীর্ঘ মনে হল। জানলার মধ্যে দিয়ে সবুজ-লাল গাছপালা আর রুপোলি জলের আয়নার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে বললে ফাদার মণ্ডল—“ভুল বাঁক নিয়ে ভুল জায়গায় এসে পড়েছি আমরা। অবশ্য ভুল জায়গায় ভুল করে পৌঁছেও অনেক সময়ে নির্ভুল কাজও করা যায়।”

ঘনশ্যাম মণ্ডলের স্বভাবই হল কম কথা বলা। কিন্তু কম কথা বলেও যারা মানুষের মনের কাছে পৌঁছে যায়, ফাদার মণ্ডল সেই জাতের মানুষ। কাজেই চুপ-চাপ বসে থাকতে থাকতেই বাঁশদ্বীপের অনেক রহস্যই জেনে নিলে পাদরী। প্রৌঢ় মিষ্টার ভৈরব চাপা মানুষ। খুব মিশুকেও নয়। কিন্তু নিজে একটি কথাও না বলে সদ্যপরিচিতের পেট থেকে অনেক কিছুই বার করে নেওয়ার কৌশল ঘনশ্যাম মণ্ডলের জানা ছিল। তাই মনিবকে ভৈরব যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করে, তা প্রকাশ পেল অচিরেই। পাদরীর কাছে অবশ্য তা অনেকটা পশু-সুলভ অন্ধ আনুগত্যের মতই মনে হল। প্রিন্স মেঘবাহনের ওপর নাকি অনেক রকম অবিচার অত্যাচার করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী নিগ্রহ করেছেন প্রিন্সেরই ছোট ভাই ক্যাপ্টেন ভার্গব। শেষোক্ত ব্যক্তির নামোচ্চারণেই শক্ত হয় উঠল মিষ্টার ভৈরবের চোয়াল, টিয়া পাখির মত নাকের খাঁজে দানা বেঁধে উঠল আতীব্র ঘৃণা। উড়নচণ্ডে ক্যাপ্টেন ভার্গব নাকি সহস্র পন্থায় দোহন করেছেন প্রিন্সকে এবং প্রায় কপর্দকহীন করে তবে ছেড়েছেন। শুধু এই ভাইয়ের জন্যেই এতদূর পালিয়ে এসেছেন প্রিন্স—এসেছেন কিছু-শান্তির আশায়।

মিস্টার ভৈরবের অনুপাতে রেবতী অনেক বেশী বলিয়ে-কইয়ে। কিন্তু মনিবের ওপর খুব সন্তুষ্ট সে নয়। মনিব সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে বারবার অন্তরের সেই অম্ল উগড়ে এল কণ্ঠস্বরে—সেই সঙ্গে

প্রচ্ছন্ন রইল ক্ষীণ আতংক। দর্পণওলা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে স্কেচ ছবিটা দেখছিল রাঘব আর ফাদার। ঠিক সেই সময়ে কি একটা কাজে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকল রেবতী। সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে পাঁচটা আয়নায় ভেসে উঠল তার মূর্তি। এঘরের বৈশিষ্ট্যই তাই। ফাদার একটু পেছনে ছিল। রেবতীর প্রতিবিম্ব দেখেই মেঘবাহন সম্বন্ধে কি একটা মন্তব্য করতে গিয়ে থেমে গেল। কিন্তু ছবির আরও কাছে ছিল রাঘব। তাই প্রতিবিম্ব না দেখেই জোর গলায় বলে উঠল—"দুই ভাইয়ের মধ্যে কে যে খারাপ আর কে যে ভাল, তা বলা মুস্কিল। দুজনের চেহারাই তো দেখছি নেহাতই গোবেচারা গোছের।" বলেই ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল রাঘব। সঙ্গে সঙ্গে কথায় মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে সরে গেল ওপাশের জানলায়।

ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্কেচের দুই ভাইয়ের দিকে আর ফাদারের ওপর স্থির পলকহীন চোখ মেলে রইল রেবতী।

ভাসা ভাসা পিঙ্গল চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল রেবতী। ঈষৎ বিস্ময় দুলে উঠল বিদ্যুদ্‌গর্ভ দুই চোখ। সে বিস্ময় ছাড়িয়ে পড়ল ঢলঢলে মুখেও। যেন, আগন্তুকদের উদ্দেশ্য ধরি-ধরি করেও ধরতে পারছে না রেবতী।

একইভাবে স্কেচের ওপর চোখ রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল ফাদার মণ্ডল। পেছন ফিসফিস করে বললে রেবতী ঃ

"আপনার বন্ধু ঠিকই বলেছেন। দুজনের মধ্যে কে যে ভাল, তা বলা মুস্কিল। সতিই মুস্কিল, দারুণ মুস্কিল।"

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ঘনশ্যাম পাদরী। নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করল—"বুঝলাম না কি বলতে চাইছেন।"

কালো মেঘের মধ্যে এবার বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল—দপ্‌ করে জ্বলে উঠল রূপসীর দুই চোখ।

কঠিন কণ্ঠে বললে—"ক্যাপ্টেন ভার্গব টাকা নিয়ে যতখানি অন্যায় করেছেন, প্রিন্সও টাকা দিয়ে ততখানি অন্যায় করেছেন। দোষের ভাগী ক্যাপ্টেন একা নন, দুজনেই।"

নিবাত নিষ্কম্প দেহে দাঁড়িয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম। আস্তে আস্তে আলো জ্বলে উঠল বোকা-বোকা দুই চোখে। অধরোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শুধু একটি অস্ফুট শব্দঃ "ব্ল্যাকমেল।"

ঠিক তখনি পেছনে তাকিয়েই দারুণ চমকে উঠল রেবতী। ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল মুখ।

নিঃশব্দে কখন জানি দরজা খুলে গেছে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ভৈরবের ফ্যাকাশে মূর্তি—অনেকটা প্রেতচ্ছায়ার মতই। আয়না-বসানো দেওয়ালের ভৌতিক কায়দার ফলেই যেন একই সঙ্গে পাঁচটা দরজায় দাঁড়িয়ে পাঁচজন ভৈরব।

নীরস কণ্ঠে বললে ভৈরব—"হিজ হাইনেস এসে গেছেন।"

বলতে না বলতেই বিদ্যুৎরেখার মতই প্রথম জানলার সামনে দিয়ে সরে গেলেন একজন পুরুষ। ছায়াছবির মতই কাঁচের ওপর ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল তাঁর রোদ্দুর ঝকমকে মূর্তি। পরমুহূর্তেই দেখা গেল তাঁকে দ্বিতীয় জানলায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা আয়নার একই সঙ্গে ভেসে উঠল একই প্রতিবিম্ব ঃ ঈগল পাখির মত ধারালো নাক-মুখ চিবুক ; কৃশ কিন্তু যষ্টির মত সিধে দেহ ; মাথার চুল ধবধবে সাদা। শুভ্র অথচ পাণ্ডুর মুখ ; শাণিত ঠোঁট আর থুৎনির অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে কালো পাকানো গোঁফ আর কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে ; আঁটসাঁট সাদা পোশাক, থিয়েটারের নায়কের মত দাড়ির সঙ্গে মানানসই ছোট একটা রুপোবাঁধানো ছড়ি—এক-হাত দিয়ে ছড়িটা দ্রুত ঘোরাতে ঘোরাতে সামনের দরজায় এসে পৌঁছলেন তিনি।

দরজার সামনে ভৈরবকে দেখেই সোল্লাসে বলে উঠলেন—"এসে গেছি।"

প্রত্যুত্তরে নিম্নকণ্ঠে কী বলল ভৈরব, ঘরের ভেতর থেকে কিছুই শোনা গেল না। ক্ষণপরে জোর গলায় বললে—"সব তৈরী, আসুন।"

পরমূহূর্তেই প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিমায় ঘরে ঢুকলেন প্রিন্স মেঘবাহন। আবার দেখা গেল সেই ভৌতিক দৃশ্য। একই সঙ্গে পাঁচটা আয়নায় ফুটে উঠল একই প্রতিবিম্ব—পাঁচটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন পাঁচজন প্রিন্স।

ছড়িটা টেবিলের দিকে আলতো করে ছুঁড়ে দিয়ে তুহাত সামনে বাড়িয়ে ভরাট গলায় বললেন :—"মিস্টার রাঘব হাজরা, খুশী হলাম আপনাকে দেখে। আপনার নাম ডাক শুনেই আলাপ করার ইচ্ছে হয়েছিল। অশোভন কিছু বলে ফেললাম না তো?"

"মোটেই না, মোটেই না" হেসে উঠে বললে রাঘব। "স্রেফ পুণ্য ক'রে তুনিয়ার খুব অল্প লোকই নামডাক করে।"

কথাটার মধ্যে ব্যক্তিগত খোঁচা আছে কিনা, তা ধরতে না পেরে চকিতে তির্যক চোখে বিদ্যুৎ দৃষ্টি হানলেন প্রিন্স। পর মুহূর্তে অট্টহাস্য করে চেয়ার এগিয়ে দিলেন তুই অতিথিকে। নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

শিশুর মত বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল ফাদার ঘনশ্যাম। একটা সংজ্ঞাহীন কল্পনায় ছটফট করছিল ভেতরটা। বলে বোঝানো যায় না সে অনুভূতি। প্রিন্সের পরিপাটি করে ঢেউখেলানো শ্বেত-শুভ্র চুল, হাতির দাঁতের মত পাণ্ডুর মুখ আর সৌখীন মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল মণ্ডলের। চেহারার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই—যদিও এ মূর্তি স্টেজে ফুটলাইটের সামনে দাঁড়ালেই ভাল মানাত। কিন্তু ঘনশ্যামের যা কিছু নামহীন কৌতূহল, তা ওই মুখের কাঠামোর জন্যে। কোথায় যেন

মুখটা দেখেছে সে, অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না। যেন তার পুরোনো বন্ধুই নতুনভাবে সেজেগুজে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। অর্ধেক মনে পড়ার দুঃসহ যন্ত্রণায় পাগল হবার উপক্রম হল ঘনশ্যাম। ঠিক এই সময় মনে পড়ল এ ঘরের আয়নাগুলোর কথা। নিশ্চয় কোনো মনোস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। একই সঙ্গে একই মানুষের এতগুলো প্রতি-ফলন দেখার ফলেই নির্জ্ঞান মনের কোনো কিম্ভূতকিমাকার কল্পনা। ভেবে, অনেকটা আশ্বস্ত হল ফাদার মণ্ডল।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন প্রিন্স—"যাই বলুন জায়গাটায় শান্তি আছে। কাজের হট্টগোল নেই। মাছ ধরতে বসলে কাজের কথা মনেও থাকে না।"

রাঘব হাজরার মাছ ধরার বাতিক আছে শুনে তক্ষুণি তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্রিন্স। বাঁশদ্বীপ ছাড়িয়ে কিছুদূরে একটা নিরালা অথচ নিরাপদ জায়গায় তাকে বসিয়ে ফিরে এলেন মিনিট কুড়ির মধ্যেই নিজের ডিঙ্গিতে। হাস্য-পরিহাস শুরু করলেন ফাদার মণ্ডলের সঙ্গে। দার্শনিক আলোচনাও হল। প্রিন্সের প্রধান হবি মাছ ধরা আর বই পড়া। দুচারটে বইয়ের নাম শুনে অবশ্য খুব উল্লসিত হতে পারলেন ফাদার ঘনশ্যাম। সবশুদ্ধ ছটা ভাষা তিনি জানেন। কিন্তু অধিকাংশ শব্দই গালিগালাজ। বহু বছর তিনি দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। হাসি-ঠাট্টার ফাঁকে ফাঁকে ভ্রমণকাহিনী যা শোনালেন, তার অধিকাংশই হল জুয়ার আড্ডা আর আফিমের আড্ডা নিয়ে। পর্যটন অভিজ্ঞতা যে এত ন্যক্কারজনক হতে পারে, তা এই প্রথম জানল ফাদার মণ্ডল।

অতিথিসৎকারের কোন ত্রুটি রাখলেন না প্রিন্স। ভেতরটা ফোঁপরা হলেও বৈঠকী পুরুষ তিনি। কিন্তু কথাবার্তা কেমন যেন। সুরাসক্তি থাকলেও এরকম স্নায়ুর বিকার দেখা যায়। দুই চোখে কেমন জানি বুনো উদ্দামতা। সংসারের কোনো

ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্ব আছে বলে মনে হল না। সংসারের সর্বময় প্রভু যেন মিস্টার ভৈরব। চাকরবাকররা তার নামে থরহরিকম্প। প্রিন্সের সঙ্গে ভৈরবের কথাবার্তা খুবই সংযত, কিন্তু বিনয়বিগলিত নয়। মিস্টার ভৈরব যেন প্রিন্সের ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। কিছুক্ষণ আগেও রেবতী প্রিন্সের ছোটভাইয়ের নামে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন যেন ছায়ার মতই আড়ালে আড়ালে রইল সে। যা কিছু কথা তার ভৈরবের সঙ্গেই—প্রিন্সের ত্রিসীমানায় দেখা গেল না তাকে। ছোটভাইয়ের ব্ল্যাকমেল সম্পর্কে সেই অগ্নিগর্ভ ফিসফিসানি তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটিও আর শোনা গেল না রেবতীর মুখে। মেঘবাহন পরিবারের সব কিছুই যেন নিবিড় রহস্যে ঘেরা। বিশেষ করে স্বয়ং প্রিন্সের চালচলনের ফলেই তা আরো ঘনীভূত।

সূর্য অস্তাচলের পথে। হলুদ সোনা রঙ ছড়িয়ে পড়েছে বনের শীর্ষে। উদাসদৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে বলল ফাদার মণ্ডল—“রাঘব ফিরে এলে ভাল হত।”

সকৌতুকে বললেন প্রিন্স—“আপনি ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে ? শুনুন, নিয়তি নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু নিয়তি অমোঘ। যার কপালে যা প্রাপ্য, তা সে পাবেই। বিধাতার বিচার সম্পর্কে নিশ্চয় আপনার কোনো সন্দেহ নেই ?”

“আমি ভাবছি মহাবিচারের কথা, শেষ বিচারের কথা,” বলল ফাদার মণ্ডল।

তীক্ষ্ণ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন প্রিন্স—“তার মানে ?”

“ভুল করে আমরা আজ ভুল জায়গায় এসে পৌঁচেছি। এখানে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটবে—সবই ভুল, অন্যায় অবিচার। এখানে নির্দোষ সাজা পায় দোষী পার পেয়ে যায়।”

আশ্চর্য, এবার কিন্তু কোনো জবাবই দিলেন না প্রিন্স। নিরুত্তরে শক্তচোখে তাকিয়ে রইলেন ফাদার ঘনশ্যামের দিকে। আর

ঘনশ্যাম চেয়ে রইল বাইরে—পড়ন্ত সূর্যের আলোয় আলোকিত বাগানের দিকে।

আচমকা নিঃশব্দে খুলে গেল আয়নাবসানো ঘরের দরজা; নিঃশব্দে দোরগোড়ায় আবির্ভূত হল স্বল্পভাষী মিস্টার ভৈরব। মাথা না নুইয়ে আড়ষ্ট সম্ভ্রম রক্ষা করে একই সঙ্গে পাঁচ আয়নায় কথা বলে উঠল তার মূর্তি ঃ

"খবরটা না জানিয়ে পারলাম না। এইমাত্র একটা নৌকা এসে পৌঁছালো। দাঁড় টানছে ছজন দাঁড়ি। হালে বসে একজন জোয়ান ছেলে।"

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত সঙ্গে সঙ্গে সটান দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রিন্স মেঘবাহন।

"জোয়ান ছেলে!"

মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই দ্রুতবেগে সঞ্চরমান রেখার মতই পর পর তিনটে জানলার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটি তরুণ মূর্তি। ছিপছিপে একহারা চেহারা। সতেজ নবীন মুখে দাড়িগোঁফ সযত্নে কামানো। দৃঢ় শাণিত থুৎনি। পরণে আঁটসাঁট চুড়িদার পায়জামা আর জড়ির কাজকরা ভেলভেটের খাটো কুর্তা। বেশভূষা সেকেলে হলেও দৃপ্ত পদক্ষেপের মধ্যে ঠিকরে পড়ছে অপরিসীম ব্যক্তিত্ব। পর্বতমুষিক শিবাজীর মত অসাধারণ ক্ষিপ্র আর বীরত্বব্যঞ্জক তার চেহারা।

আবার সেই অব্যক্ত বেদনায় মনে মনে গুমরে উঠল ফাদার মণ্ডল। অর্ধেক মনে না পড়ার দুঃসহ যন্ত্রণা। সতেজ দূর্বার মত তরুণের এ মুখ যেন এর আগেও দেখেছে পাদরী। কিন্তু কোথায়? কোথায়?

"রাস্কেল" বলেই একলাফে নিজেই উঠে গিয়ে দরজা আটকে দাঁড়িয়েছিলেন প্রিন্স। ঠিক সেই মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালো তরুণটি। একটু পেছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে তারই

একজন সঙ্গী। মিশমিশে কালো চেহারা। এক মাথা বাবরি চুল। কানে মাকড়ি ; এক হাতে একটা বেহালার বাক্সের মত লম্বা কালো বাক্স।

তারও পেছনে আঘাটায় ভিড়েছে একটা বড় নৌকো। ডাঙার ওপর টেনে তোলা হয়েছে নৌকোটা। দাঁড়গুলো বল্লমের মত ওপরে তুলে মারমুখো ভঙ্গিমায় নৌকো ঘিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িরা। প্রত্যেকের কানে মাকড়ি।

অনাড়ষ্ট সপ্রতিভ কণ্ঠে প্রশ্ন করল তরুণ—“আপনার নাম মেঘবাহন ?”

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘাড় কাৎ করে সায় দিলেন প্রিন্স।

“আমার নাম রুদ্রপ্রতাপ।”

“নামটা আমি শুনেছি,” শ্লেষ-বঙ্কিম ঠোঁটে জবাব দিলেন প্রিন্স।

“আপনার জন্যে ভেট এনেছি,” বলে, বাতাসে মাথা ঠুকে বো করল রুদ্রপ্রতাপ, বাঁ-হাত চুলের ওপর বুলিয়ে নিয়ে অকস্মাৎ ডান হাতে প্রচণ্ড চড় মারলে প্রিন্সের কানের ওপর। এত জোর যে টলমল করে উঠলেন প্রিন্স এবং ধাক্কা লেগে একটা অতিকায় ফুলদানি গড়িয়ে পড়েই গেল চুরমার হয়ে।

প্রিন্স কাপুরুষ নন। পলক ফেলার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি তরুণের ওপর এবং সবশুদ্ধ গড়িয়ে পড়লেন ঘাসজমির ওপর। কিন্তু অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় যেন পাঁকাল মাছের মতই পিছলে গিয়ে নিমেষে উঠে দাঁড়াল রুদ্রপ্রতাপ।

হাঁপাতে হাঁপাতে সবিনয়ে বললে “ঠিক আছে। অপমান যখন করেছি, তখন তার একটা বিহিত হওয়া দরকার। রণ্ডা, বাক্স খোলো।”

বাবরিচুলো মিশমিশে জোয়ান এগিয়ে এসে দাঁড়ালো ঠিক পেছনে। কালো বাক্সটা ঘাসের ওপর রেখে খুলে ফেললে। ভেতর

থেকে বেরুলো দুটো ইটালিয়ান ফেন্সিং তরবারি। ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখার মত ঝকঝকে ধারালো ফলা। চকচকে ইস্পাতের হাতল। দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়ার উপযুক্ত তরোয়ালই বটে।

দুটো তরোয়ালই ঘাসজমির ওপর গেঁথে রেখে সরে দাঁড়ালো মিশমিশে জোয়ান।

দুহাতে দরজা অবরোধ করে দাঁড়ালো তরুণ রুদ্রপ্রতাপ। অনতিদূরে ঘাসজমির ওপর সুদীর্ঘ ক্রুশের মত উঠে রইল তরোয়াল দুটো। তারও পেছনে সারি দিয়ে নৌকো ঘিরে দাঁড় তুলে স্থির হয়ে রইল দাঁড়িরা।

সূর্যের রশ্মি তখন আরো ম্লান হয়ে এসেছে। সারাদিন দুরন্তপনার পর ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়েছে নিবিড় অরণ্য।

"প্রিন্স মেঘবাহন", বললে রুদ্রপ্রতাপ, "আমি তখন শিশু। দোলনার বাইরে জগতের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। তখন আপনি আমার বাবাকে হত্যা করেছিলেন আর মাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন। বাবা মরে বেঁচেছিলেন—মায়ের চাইতে কপাল ভাল তাঁর। তবে পুরুষের মত বাবাকে আপনি মরতে দেননি—কিন্তু আমি আপনাকে সেইভাবেই এখুনি মারব। আপনি আর আমার মা দুজনে মিলে গাড়ি হাঁকিয়ে বাবাকে নিয়ে গেছিলেন পাহাড়ের ওপরে একটা খাদের কিনারায়—সেখান থেকে জোর করে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। লোকে জেনেছিল, আত্মহত্যা করেছেন তিনি। ইচ্ছে করলে সেইভাবেও আপনাকে শেষ করতে আমি পারি—কিন্তু আপনার মতো জঘন্য কীটকে অনুকরণ করাও মহাপাপ। সারা দুনিয়ায় আপনার পিছু পিছু থেকেছি আমি—কিন্তু প্রতিবারই আমার হাত এড়িয়ে আপনি পালিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ার শেষ এইখানে—আপনারও শেষ এইখানে। এবার আমি পেয়েছি আপনাকে। কিন্তু যে সুযোগ আমার বাবাকে আপনি দেননি, সে সুযোগ আপনাকে আমি দিচ্ছি। প্যারিসে থাকতে তরোয়াল

খেলা শিখেছিলেন আপনি। আমিও শিখেছি সেখানে। দুটো তরোয়ালের যে কোনো একটা বেছে নিন।"

কপাল কুঁচকে ক্ষণেকের জন্য দ্বিধা করলেন প্রিন্স মেঘবাহন। কিন্তু চড় খেয়ে তখনও তাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছে। কাজেই এক লাফে সামনে এগিয়ে গিয়ে ঝটিতি তুলে নিলেন একটি তরবারি।

ফাদার মণ্ডলও লাফিয়ে এগিয়ে গেল। উদ্দেশ্য ছিল মাঝে পড়ে বিবাদের মিটমাট করা। কিন্তু দেখা গেল হিতে বিপরীত হল। প্রিন্স মেঘবাহন গোঁড়া হিন্দু। দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেখানে অপমানের নিষ্পত্তি সেখানে কোন পাদরীকে বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অপরপক্ষে তরুণ রুদ্রপ্রতাপের মুখের রেখায় শিবাজীর মত অনমনীয় দৃঢ়তা, নেপোলিয়নের মত দুর্জয় সংকল্প—পাদরীই হোক কি স্বয়ং ঈশ্বরই হোক—আরব্ধ কর্ম থেকে তাকে টলানোর ক্ষমতা কারোরই নেই। এ যেন প্রস্তরে গড়া প্রস্তর যুগের মানুষ। নিষ্ঠুর, নির্মম, নির্দয়। পিঙ্গল চোখে তার ইস্পাতের ঝিলিক।

এখনও আশা আছে। বাড়ির সবাইকে ডেকে এনে এখুনি বন্ধ করতে হবে এই মৃত্যুযুদ্ধ। দৌড়ে বাংলোর মধ্যে ঢুকে পড়ল ফাদার মণ্ডল।

কিন্তু বাংলো একদম শূন্য। স্বেচ্ছাচারী ভৈরব চাকরবাকরদের ছুটি দিয়ে পাশের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। শূন্য কক্ষে অস্থির চরণে পায়চারী করছে শুধু রেবতী।

ঘনশ্যামের পায়ের শব্দে সে ভয়ার্ত পাণ্ডুর মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই রহস্যাবৃত বাঁশবাংলোর একটা হেঁয়ালীর সমাধান করে ফেলল পাদরী। ভাসাভাসা ঐ পিঙ্গল চক্ষু এইমাত্র সে দেখে এসেছে রুদ্রপ্রতাপের ইস্পাতকঠিন মুখে। বিদ্যুৎচমকের মতই গল্পের আধখানা ভেসে উঠল পাদরীর মনে পর্দায়।

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে বললে—"আপনার ছেলে

এসেছে। হয় সে, আর না হয় প্রিন্স এখুনি মরবে। মিস্টার ভৈরব কোথায়?”

ক্ষীণ কণ্ঠে বলল রেবতী—“ঘাটে। লোকজন ডাকতে গেছে।”

বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলল ফাদার মণ্ডল—“মিসেস মেঘবাহন, বাজে কথা বলার সময় এটা নয়। নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছে আমার বন্ধু। আপনার ছেলের নৌকো পাহারা দিচ্ছে তারই সাঙ্গপাঙ্গরা। আর একটা মাত্র ডিঙ্গি আছে ঘাটে। মিস্টার ভৈরব তা নিয়ে কি করছে?”

“ওঃ ভগবান, আমি জানি না,” বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর সটান আছড়ে পড়ল রেবতী।

ফাদার মণ্ডল তাড়াতাড়ি একটা সোফার ওপর শুইয়ে দিল অচেতন মেঘবাহন-প্রেয়সীকে, চোখে-মুখে মাথায় জল ছিটিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল পেছনের দরজা দিয়ে। কিন্তু ঘাটের একটি মাত্র ডিঙি ততক্ষণে মাঝদরিয়ায়। প্রাণপণে অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় দাঁড় টানছে ভৈরব—এতখানি বয়েসে এরকম জোয়ানের মত দাঁড় টানা যে সম্ভব—তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

“বাঁচাতেই হবে, প্রিন্সকে বাঁচাতেই হবে!” ঘাটের ওপর ফাদারের খর্বকায় মূর্তি দেখেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ভৈরব—উন্মাদের মত ঠেলে বেরিয়ে আসা দুই চোখ দেখে অবাক হয়ে গেল পাদরী। “বাঁচাতেই হবে, এখনও সময় আছে! এখনও সময় আছে!”

কিছুই আর করবার ছিল না। তাই নিশ্চুপ হয়ে ডিঙির দিকে তাকিয়ে রইল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। সত্যিই, এখনও সময় আছে। পাশের গাঁ থেকে লোকজন ডেকে এনে এখনও এই ডুয়েল থামাবার সময় আছে।

নিষ্পলক চোখে দুলন্ত নৌকো, আর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়া জলের আয়নার দিকে চেয়ে ছিল ফাদার। কিন্তু হঠাৎ চমক

ভাঙল একটা শব্দ শুনে। না ভুল হয়নি। ফাদার মণ্ডল জানে এ শব্দ কিসের। কনকনে ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকাঠুকির হিমশীতল শব্দ। যন্ত্রচালিতের মত ঘুরে দাঁড়াল পাদরী ঘনশ্যাম।

দূরে, ডিম্বাকৃতি দ্বীপের এক প্রান্তে, গোলাপঝাড়ের ওপাশে, মৃত্যুপণে তলোয়ার মিলিয়েছে হিংসাপাগল দুই পুরুষ। সূর্যের শেষ আলো এসে পড়েছে শ্বেতশুভ্র দুই মূর্তির ওপর। ভেলভেটের কুর্তা খুলে ফেলেছে তরুণ রুদ্রপ্রতাপ। সবুজ ঘাসের ওপর হীরের পিনের মতই রোশনাই ছড়াচ্ছে দু দুটো তরবারি।

শুভ্র সুন্দর দুটো প্রজাপতি যেন খেলায় মেতেছে। সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় দুজনেই পরস্পরকে গেঁথে ফেলতে চাইছে হীরের পিন দিয়ে।

নির্বিকারভাবে দূর থেকে এ দৃশ্য দেখা যায় না। কাজেই হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে গেল পাদরী ঘনশ্যাম।

কিন্তু বৃথা তার যাওয়া। কেননা, বৈঠার ওপর ভর দিয়ে দুজন দাঁড়ির দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এ খেলায় কোনো বাধা তারা সহ্য করবে না। লড়াই যে কখন শেষ হবে, তাও বলা মুস্কিল। কেননা, দুজনেই সমান দক্ষ। ভোমরার ডাক ছেড়ে দুজনেরই হাতে অসি ঘুরছে বিদ্যুৎবেগে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। প্রিন্সের অসি চালনার মধ্যে ধীরস্থির গাণিতিক হিসাব। কিন্তু রুদ্রপ্রতাপের অসি ঘুরছে বেপরোয়াভাবে ; তৈলমসৃণ ক্ষিপ্রতায় ঘুরছে তার মণিবন্ধ ; ছেলেখেলার মতই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আঘাত দিয়ে আঘাত প্রতিহত করে হানছে পাল্টা আঘাত, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, যতি নেই, শুধু আছে গতি ; অবিশ্বাস্য, অসম্ভব সেই গতির সামনে ধীরে ধীরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন প্রিন্স ; ধীরে ধীরে দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে ঘুরতে লাগল তাঁর তরবারি।

এ যেন গল্প কথা, বাস্তব নয়। ছায়াছবির কপোল-কল্পিত কাহিনীই বুঝি সহসা অভিনীত হচ্ছে নির্জন বাঁশদ্বীপে।

নিঃসীম উৎকণ্ঠার মধ্যেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পাদরী। এই হারে যদি যুদ্ধ চলতে থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে লোকজন পুলিশ নিয়ে পাশের গ্রাম থেকে এসে যাবে ভৈরব। রাঘবও ফিরে আসতে পারে। রাঘবের কথা ভাবতেই মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে ওঠে ঘনশ্যামের। অসুরের মত বলবান রাঘব একাই চারটে পুরুষকে বগলদাবা করে রাখতে পারবে।

আচমকা ঠনাঠন ঠনাঠন শব্দ আরও দ্রুত হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই প্রিন্স মেঘবাহনের পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল তরবারির সুতীক্ষ্ণ ডগা। দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে আর্ত চীৎকার করে উঠলেন প্রিন্স। তরবারিটা শেষবারের মত রোশনাই ছড়িয়ে ঘুরপাক খেয়ে গিয়ে পড়ল হ্রদের জলে। ছিন্নমূল লতার মতই ধরাশায়ী হল তাঁর দেহ। দেহভারে মুচড়ে গেল একটা গোলাপ গাছ। একরাশ ধুলো রক্তমেঘের মতই উৎক্ষিপ্ত হল ওপরে।

রক্ত দিয়েই পিতার অতৃপ্ত আত্মার তর্পণ করল তরুণ রুদ্রপ্রতাপ।

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োলো ফাদার ঘনশ্যাম। ক্ষুদে ক্ষুদে পা দুটো চাকার মতই বেগে ঘুরতে লাগল। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল প্রিন্সের রক্তাক্ত দেহের ওপর।

কিন্তু সার্থক রুদ্রপ্রতাপের অসিশিক্ষা। এক আঘাতেই শূন্য হয়ে গেছে পিতৃঘাতকের প্রাণপিঞ্জর। নিষ্প্রাণ দেহে এতটুকু স্পন্দন না দেখে অভিভূতের মত উঠে দাঁড়াল ফাদার মণ্ডল।

একটু পরেই বিষম ঠাট্টার মতই অকস্মাৎ দূরে শোনা গেল কোলাহল। পর পর কতকগুলো নৌকা বাঁক ঘুরে তীরবেগে ছুটে আসছে ঘাটের দিকে। দেখতে দেখতে ঘাটে ভিড়ল নৌকাগুলো। টপাটপ লাফ দিয়ে নামল পুলিশ কনস্টেবল আর দারোগা, ভৈরব আর কিছু গ্রামবাসী।

আচ্ছন্ন চোখে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে আপন মনে বললে ঘনশ্যাম—"এত দেরীতে কেন এল ভৈরব ? আর ক'মিনিট আগে এল না কেন ? কেন ? কেন ?"

প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হল তরুণ রুদ্রপ্রতাপকে। মেঘবাহন ধরণী আশ্রয় করার পর থেকেই শোণিতরঞ্জিত অসির ওপর ভর দিয়ে পলকহীন চোখে প্রাণহীন প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। অর্ধনিমীলিত পিঙ্গল দুই চোখের আশ্চর্য সেই প্রশান্তি ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

পুলিশ ঘিরে দাঁড়াতেই রক্তমাখা তরোয়ালটা মাটির ওপর গেঁথে নিজে থেকেই দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে শান্ত তৃপ্ত কণ্ঠে বলল রুদ্রপ্রতাপ "—আমার আর কিছু বলার নেই। কিছু বলার নেই। এবার আমার ফাঁসি হোক।"

বাস্তবিকই আর একটি কথাও বলেনি রুদ্রপ্রতাপ। বিচার চলার সময়ে শুধু দুটি শব্দ শোনা গেছিল তার মুখে—"আমি খুনী।" ব্যস, ফাঁসির দড়িতে ঝোলা পর্যন্ত আর তৃতীয় কোনো শব্দ তাকে বলতে কেউ শোনেনি।

যথারীতি পরীক্ষার পর লাশ নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ বোটে। সাক্ষ্য নেওয়া হল ফাদার ঘনশ্যামের। কিন্তু পুলিশ বোটে গ্রামে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সবিনয়ে। ধীরে ধীরে আবার জনবিরল হয়ে এল বাঁশদ্বীপ। দূর হতে দূরে সরে গেল নৌকোগুলো।

আর, একাকী বাঁশঝাড়ের কাছে সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে রইল ফাদার। সূর্য ডুবে গেছে। রক্তরাঙা আকাশের দিকে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে রইল ঘনশ্যাম।

সব শেষ। কিন্তু সত্যিই কি সব শেষ ?

ফাদার মণ্ডল নিজেই জানে না, কেন একটা কালো সন্দেহ উদ্গত তমিস্রার মতই ঠেলে উঠে আসতে চাইছে তার নির্জ্জন মনের

কন্দর থেকে। সব শেষ হলেও এখনও কিছুই শেষ হয়নি। ফাদার ঘনশ্যামের মন বলছে এখনও অনেক রহস্য রয়ে গেছে এই আশ্চর্য দ্বীপে। এখনও কোনো মীমাংসা হয়নি সে সব হেঁয়ালির।

আচম্বিতে ভৌতিক ছায়ার মতই নিঃশব্দে একটা নৌকা ভেসে এল ঘাটের দিকে। পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ একজন পুরুষ—হাতে ছিপ। রাঘব হাজরা।

শিশুর মত অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ফাদার মণ্ডল—"রাঘব রাঘব, তুমি এখনও মরোনি?"

অবাক হয়ে গেল রাঘব। ঘাটে নৌকো বেঁধে বাঁশের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললে—"মরতে যাবো কোন দুঃখে?"

কাঁদো কাঁদো গলায় বললে ঘনশ্যাম—"সবাই তো মরছে। প্রিন্স মারা গেলেন, রুদ্রপ্রতাপ ফাঁসিতে ঝোলার জন্যে চলে গেল, মনে হচ্ছে আমিও বেঁচে নেই। তুমিও বেঁচে নেই।" বলতে দুহাতে রাঘবকে কাছে টেনে নিলে মণ্ডল—বুকের ওপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শিশুর মত।

হতবাক হয়ে গেছিল রাঘব হাজরা।

ক্ষণকাল পরে ধীরপদে দুজনে এগোলো বাঁশবাংলোর দিকে। সকালবেলা সর্বপ্রথম বাঁশদ্বীপে নেমে জানলা দিয়ে ঘরের দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল দুজকেই। এখনও প্রথমবারের মতই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল দুই বন্ধু। ঘরের মধ্যে দেখা গেল নতুন দৃশ্য।

পিতৃহন্তাকে নিকেশ করতে রুদ্রপ্রতাপ যখন বাঁশদ্বীপে ধূমকেতুর মতো এসে পৌঁছায়, তখনি বিশাল লম্বা টেবিলটায় খাবারদাবার সাজানো হচ্ছিল। কিন্তু অতর্কিতে অসিযুদ্ধের ফলে সে খাবার কেউ স্পর্শ করেনি।

এখন দেখা গেল, সুদৃশ্য কতকগুলো লণ্ঠন আর শামাদান জ্বলছে টেবিলের ওপর আর ঘরের কোণে কোণে। লাখো রোশনাইয়ের

ছটায় মায়াকক্ষের মতই ঝলমল করছে আয়না-কক্ষ। যেন মহফিল জমেছে অমরাবতীর মুকুরমহলে। আয়নায় প্রতিফলনের দরুণ ঘরের পরিধি যেন অনেক দূরে ছড়িয়ে গেছে—জ্বলছে অগুনতি দীপ।

শুরু হয়েছে ভোজপর্ব। সুদীর্ঘ টেবিলের এ মাথায় বসেছে ভৈরব। ও মাথায় রেবতী। ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা।

স্তম্ভিত হয়ে গেল দুই বন্ধু। রাঘব আর সামলাতে পারলে না। প্রথম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল বিকট গলায়—"বাঃ বাঃ চমৎকার! মনিব মরতে না মরতেই মনিবের মুখের খাবার চুরি!"

আস্তে আস্তে মুখ তুলল ভৈরব। সন্তর্পণে একটা মাছের বড়ার কোণ কামড়ে বললে ততোধিক মন্থর কণ্ঠে—"জীবনে আমি বিস্তর চুরি করেছি। কিন্তু এ খাবার আমার নিজের। এই বাড়ি আমার নিজের। এই দ্বীপ আমার নিজের।"

ভুরু কুঁচকে রাঘব বললে—"অর্থাৎ প্রিন্স মেঘবাহনের উইল অনুসারে আপনিই এখন সব কিছুর মালিক?"

"আমিই প্রিন্স মেঘবাহন," বলে সুরাপাত্র মুখের কাছে তুলে ধরল ভৈরব।

আনমনে বাইরে তাকিয়েছিল ঘনশ্যাম। কথাটা শুনেই গুলিবিদ্ধ হরিণের মতই লাফিয়ে উঠল।

"আপনি কে?" প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে ফাদার মণ্ডল।

"প্রিন্স ভৈরব মেঘবাহন। যেহেতু রাজ্য ছেড়ে বহুদূর শান্তিতে কাটাতে চাই, তাই 'প্রিন্স'টুকু বাদ দিয়েছি। ডাকাডাকির সুবিধের জন্য শুধু মিস্টার ভৈরব বলেই ডাকা হয় আমাকে। আমি গেরস্ত মানুষ। কিন্তু আমার ভাই সংসার-ফংসার কিছু বোঝে না। বড় উঞ্ছ টাইপের। নাম তার ভার্গব। শুনলাম, একটু আগেই নাকি বাগানে মৃত্যু হয়েছে তার। ভায়া আমার পয়লা

নম্বরের দুশ্চরিত্র আর উড়নচণ্ডে। কাজেই শত্রু যদি তাকে সুন্দরবন পর্যন্ত ধাওয়া করে, তবে দোষটা নিশ্চয় আমার নয়।”

সুরাপাত্র নামিয়ে রেখে আবার মাছের বড়া তুলে নিল প্রিন্স ভৈরব মেঘবাহন। বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রথম সাদৃশ্যটা লক্ষ্য করল ফাদার মণ্ডল। স্কেচে আঁকা দুই ভাই-ই বটে। ভার্গবের মুখে গোঁফদাড়ি থাকাতেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল রহস্য।

স্থির গ্র্যানাইট পাথরের মত মুখে রেবতীর মাথার ওপর দিয়ে ওপাশে তাকিয়েছিল ভৈরব। মুখের একটি রেখাও কাঁপল না—কিন্তু আচম্বিতে সমস্ত দেহ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। যেন দম আটকে আসছে তার।

“ফাদার!” সবিস্ময়ে বললে রাঘব “এ যে দেখছি হাসছে!”

কান্নার মত করুণ কণ্ঠে বললে ফাদার মণ্ডল—“রাঘব! রাঘব! চলো আমরা যাই। এ অভিশপ্ত দ্বীপে আর এক সেকেণ্ডও নয়।”

নুড়িবিছানো পথ বেয়ে দ্রুত নেমে এল দুই বন্ধু। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার আগেই নৌকো ভেসে চলল পাশের গ্রামের দিকে। দপদপ করে শুধু দুটো অতিকায় চুরুট জ্বলতে লাগল দুজনের মুখে।

কিছুক্ষণ পরে চুরুট নামিয়ে ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করলে—“গল্পটা কি বলতে হবে, রাঘব?”

“ফাদার, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।”

“গোলমেলে কিছুই নেই রাঘব। প্রিন্স মেঘবাহনের দুজন শত্রু ছিল। একজন তার উঞ্ছ ভাই,—অপরজন রুদ্রপ্রতাপ। প্রিন্স বুদ্ধিমান পুরুষ। একজন শত্রু থাকলে মুস্কিল হত। দুজন থাকতে অনেক সুবিধে হয়ে গেল।”

“এখনও বুঝলাম না।”

“ভার্গব মেঘবাহন কোনরকমে দাদার কুকীর্তি জেনে

ফেলেছিল। সে জানত, রুদ্রপ্রতাপের বাবাকে ভৈরব নিজের হাতে খাদের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছেন। দুই ভাই-ই সমান পাষণ্ড, সমান বদমাস। কিন্তু ভৈরব একটু উঁচুদরের—তাই তাঁর গতি ঊর্ধ্বমুখে। আর ভার্গব একটু নীচুদরের—তাই তার গতি নিচের দিকে। আজকের ঘটনাতেই তা প্রমাণিত হল। দাদার অপকর্মের কাহিনী জেনে ফেলে শুরু হোল ভাইয়ের অপকর্ম। ক্যাপ্টেন কোনোকালে ক্যাপ্টেন ছিল কিনা জানি না—হয়ত খেতাবটা তার নিজেরই বানানো। তা না হলে কোনো সামরিক অফিসারের পক্ষে এরকম ব্ল্যাকমেল করা সম্ভব নয়। ভাইয়ের মুখবন্ধ করতে প্রায় ফতুর হয়ে এলেন প্রিন্স।

"এই সঙ্গে জুটল নাছোড়বান্দা রুদ্রপ্রতাপ। মাকে যখন ইলোপ করা হয়, তখন সে শিশু। কিন্তু তারপর মধ্যপ্রদেশের দুর্দান্ত বন্য বাসিন্দাদের মধ্যে মানুষ হল সে। তাদের নির্ভীকতা, সাহস আর অস্ত্রশিক্ষা মিশে গেল তার অস্থিমজ্জায়। মারাত্মক নিখুঁতভাবে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করার ফলেই পেল অপরিসীম মনোবল। এইবার শুরু হল পিতৃঘাতকের শোণিত দিয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রচেষ্টা। পিছু নিল সে প্রিন্সের।

"স্বদেশ ত্যাগ করলেন প্রিন্স। কিন্তু প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় নির্মম রুদ্রপ্রতাপ আঠার মত লেগে রইল তাঁর পেছনে। প্যারিসে থাকার সময়ে অসিচালনাতেও নিপুণ হয়ে উঠল রুদ্রপ্রতাপ। দেদার টাকা খরচ করলেন প্রিন্স তার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভাইয়ের মুখবন্ধ করতে গেলে রুদ্রপ্রতাপকে ধোঁকা দেওয়ার টাকায় টান পড়ে, আবার রুদ্রপ্রতাপকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে গেলে ভাইকে চুপ করিয়ে রাখার টাকা ফুরিয়ে আসে। মহাফাঁপরে পড়লেন প্রিন্স। এদিকে হু-হু করে কমে আসতে লাগল তার বিপুল বৈভব।

"ঠিক এই সময়ে একটা মাস্টার প্ল্যান এলো তাঁর মাথায়।

অতিমানব না হলে এরকম প্রতিভা সচরাচর করো মাথায় আসে না।

"পালিয়ে না বেড়িয়ে হঠাৎ দুই শত্রুর কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন প্রিন্স। জাপানী যোদ্ধাদের মতই হঠাৎ হাল ছেড়ে দিলেন। শত্রুরা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সামনে। বন্ধ করলেন ভূপ্রদক্ষিণ, ঠিকানা জানিয়ে দিলেন রুদ্রপ্রতাপকে—যা কিছু ছিল, সব তুলে দিলেন ভাইয়ের হাতে। প্রচুর টাকা পাঠালেন ভার্গবকে ঝকমকে পোশাক কিনে আরামে বেড়ানোর জন্য। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা চিঠিতে লিখলেন : আর কিছুই নেই আমার—যা ছিল সব দিলাম। তোমার শোষণে আজ আমি রিক্ত। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সুন্দরবনে আছে একটা সুন্দর দ্বীপ, সুন্দর বাংলো, দাসদাসী, খাবারদাবার। ইচ্ছে হলে এখানে এসে থাকতে পারে—শান্তি পাবে। যদি আসো এ সম্পত্তিও লিখে দেব তোমার নামে—আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো, বন্ধু হিসেবে বা সেক্রেটারী হিসেবে—যেভাবে তুমি বলবে।

"প্রিন্স মেঘবাহন জানতেন, রুদ্রপ্রতাপ তাঁদের দুই ভাইকে চাক্ষুস কোনোদিন দেখেনি। দেখেছে শুধু ফোটোগ্রাফ। দুই ভাইরের মধ্যে মিল ছিল প্রচুর। দুজনেরই ছিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফ। ভাইকে আমন্ত্রণ জানাবার পর দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেললেন প্রিন্স। শুরু হল প্রতীক্ষা।

"ফাঁদে পা দিল ক্যাপ্টেন ভার্গব। লোভ তার প্রচণ্ড। তাই দাদার শেষ সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এল বাঁশদ্বীপে—দাঁড়ালো রুদ্রপ্রতাপের তলোয়ারের সামনে।

"মানুষ মাত্রই আত্মবৎ জগৎ দেখে। ক্রিমিন্যালরাও মনুষ্য-চরিত্রের সৎদিকটার কথা ভাবতেই পারে না। প্রিন্স মেঘবাহনও পয়লা নম্বরের ক্রিমিন্যাল এবং অত্যন্ত ধুরন্ধর ক্রিমিন্যাল। নিজের চরিত্র অনুযায়ীই রুদ্রপ্রতাপকে বিচার করেছিলেন তিনি। ভেবে-

ছিলেন আঘাত আসবে অতর্কিতে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, আচম্বিতে পেছন থেকে গুলিবিদ্ধ বা ছুরিকাহত হয়ে বিদায় নিতে হবে রুদ্রপ্রতাপের পিতৃহন্তাকে। কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়ল। রুদ্রপ্রতাপ ক্রিমিন্যাল নয়। সে নাটকীয়ভাবে জানালে তার আগমনের উদ্দেশ্য। সবচাইতে আশ্চর্য, যাকে হত্যা করবার জন্যে মৃত্যুপণ করে সে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে, মারবার ঠিক আগে তারই হাতে তুলে দিলে আত্মরক্ষার অস্ত্র। এতবড় মহত্ত্ব প্রিন্স মেঘবাহন আশা করেননি। আশা করেননি মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে কুকর্মের ফিরিস্তি শোনাবে তরুণ রুদ্রপ্রতাপ।

“তবে ভার্গব সম্বন্ধে তাঁর অনুমান ভুল হয়নি। তিনি জানতেন ভার্গব শুধু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়ই নয়, নিদারুণ লোভী। এরকম অবস্থার সম্মুখীন হলে সে যে কাপুরুষের মত পিছু হটে সম্পত্তি হাতছাড়া করবে না—তা জানতেন বলেই এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

“কিন্তু যে মুহূর্তে রুদ্রপ্রতাপ একে একে বলতে লাগল তাঁর কুকীর্তির ফর্দ, তখনই মাথা ঘুরে গেল তাঁর। নাটকের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই পর্বে চোখে অন্ধকার দেখলেন তিনি। ক্ষিপ্তের মত নৌকো নিয়ে পালাতে লাগলেন বাঁশদ্বীপ ছেড়ে—সেই সময়ে তাঁর চোখে যে আতঙ্ক দেখেছিলাম, তা ভুলবার নয়। ভার্গব হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেই রুদ্রপ্রতাপ পিছু নিত তাঁর।

“কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। অপমানিত ভার্গব তরোয়াল ধরল—মুখ খুলল না। শুরু হল অসিযুদ্ধ। শেষ না হওয়া পর্যন্ত আড়ালে লুকিয়ে রইলেন প্রিন্স। শেষ হতেই গ্রাম থেকে লোকজন নিয়ে ফিরে এলেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পর রুদ্রপ্রতাপ যে মায়ের কেলেঙ্কারী কোর্টে ফাঁস করবে না, তা তিনি জানতেন। চোখের সামনেই পুলিশ নিয়ে গেল তাঁর দুই শত্রুকে—একজন জীবিত, আর একজন মৃত। তারপর দ্বীপ ফাঁকা হয়ে গেলে আয়নাঘরে দীপ জ্বালিয়ে বসলেন উৎসব করতে।”

“কী পিশাচ। এর পরেও মুখে হাসি আসে?” শিউরে উঠে বলল রাঘব—“জানি না কোন্ শয়তানের কাছ থেকে এ প্ল্যান পেয়েছিলেন প্রিন্স।”

“তোমার কাছ থেকে”, জবাব দিল ফাদার।

“আমার কাছ থেকে। বলছেন কি?” তিড়বিড়িয়ে উঠে বলল রাঘব।

পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করল ফাদার ঘনশ্যাম। পেছনে সবুজ কালিতে লেখা কয়েকটি পংক্তি।

“মনে পড়ে কি লিখে প্রিন্স নেমন্তন্ন করেছিলেন তোমাকে? মনে পড়ে, কিভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তোমার অপরাধ-জীবনের একটি ঘটনাকে? ‘একজন ডিটেকটিভ দিয়ে আর একজন ডিটেকটিভকে গ্রেপ্তার করানোর যে চমকপ্রদ কৌশল আপনার মাথা থেকে বেরিয়েছে—’...রাঘব, প্রিন্স তোমার সেই কৌশলটাই হুবহু নকল করেছেন। দুপাশে দুই শত্রুকে রেখে মাঝখান থেকে টুপ করে উধাও হয়েছেন—লড়ে মরেছে দুই শত্রু। একেই বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।”

কার্ডটা ফাদার ঘনশ্যামের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে জলে ফেলে দিল রাঘব হাজরা।

তিক্তকণ্ঠে বললে—“জাহান্নমে যাক সে কৌশল। কিন্তু মাছ-গুলোকেও বোধহয় বিষিয়ে দিলাম।”

আস্তে আস্তে ডুবে গেল টুকরো কার্ডগুলো।

মস্ত একটা গাবগাছের তলা দিয়ে দেখা গেল গোলপাতার ছাউনী দেওয়া কুঁড়ের সারি।

গল্প ফুরোতেই আমার নটে গাছটি মুড়োলো বলে উঠে দাঁড়ালাম আমি—“আজ মুখ ব্যথা হয়েছে। আবার কাল।”

অগত্যা আসর ভেঙ্গে গেল।

পরের দিন নামল বৃষ্টি। মালনাদের অতি অভদ্র বৃষ্টি। কিন্তু এমন দুর্যোগ মাথায় নিয়েও গল্পলোভীরা হাজির হলেন বিকেলে চিত্তদার বৈঠকখানায়।

কিন্তু তখনো এসে পৌঁছোলো না ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

চিত্তদা কেতাবে নাক ডুবিয়ে বসে। এদিকে কথার খই ফুটছে মেয়েমহলে। কি একটা রসিকতা করে চোখ নাচিয়ে হেসে উঠলেন অনুবৌদি।

সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে কবিতা—"বৌদি গো, আপনার মত চোখ যদি আমি পেতাম।"

"তাহলে অতি সত্বর আমাকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাতে পারতে" বললাম আমি।

কটমট করে ফিরে তাকাল গৃহিণী এবং পরমুহূর্তেই হাসি ফুটে উঠল রুষ্ট মুখে।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফাদার ঘনশ্যাম।

ছাতাটা মুড়তে মুড়তে ভেতরে ঢুকল ঘনশ্যাম বলল—"চোখ নিয়ে কি যেন কথা হচ্ছিল ?"

মুখ লাল করে আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল কবিতা।

বললাম—"কথা হচ্ছিল কালো চোখের বিভীষিকা নিয়ে।"

"সূর্যদেবের সোনালী চোখের বিভীষিকা তো তাহলে এদের শোনা উচিত।"

ইঙ্গিত স্পষ্ট। কাজেই তৎক্ষণাৎ শুরু করে ছিলাম অভিনব সেই কাহিনী।

হাওড়ার ব্রীজের ঠিক ওপরে মধ্যগগনে এসে পৌঁছোলো উগ্র তপনদেব। ব্রীজ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্ট্র্যাণ্ড রোডে পৌঁছোলো দুজন পুরুষ। একজন বেজায় লম্বা; অপরজন বেজায় বেঁটে। প্রথম জনকে উদ্ধত লম্বা মনুমেণ্টের সঙ্গে তুলনা করলে দ্বিতীয়

জনকে জি-পি-ও-র ঘাড়-মোটা বেঁটে গম্বুজের সঙ্গে তুলনা করতে হয়।

তালঢ্যাঙা লোকটার নাম রাঘব হাজরা, প্রাইভেট ডিটেকটিভ। স্ট্র্যাণ্ড রোডে নতুন তৈরী মস্ত ফ্ল্যাটবাড়িতে নতুন আপিস খুলেছে সে। আর, বেঁটে বক্কেশ্বর লোকটার নাম ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। এইমাত্র হাওড়ায় একজনের মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরছে সে, যাচ্ছে রাঘবের সঙ্গে তার নতুন আপিস দেখতে।

বাড়িটা আমেরিকান ধাঁচের। আকাশ ছোঁওয়া উচ্চতা। এন্তার টেলিফোন আর লিফ্‌ট্‌—বিস্তর যন্ত্রপাতির সে এক বিপুল তৈলমসৃণ সমারোহ। মিস্ত্রীর কাজ এখনও শেষ হয়নি। লোকজনের ভিড়ে এখনও গমগমে হয়ে ওঠেনি প্রতিটি ঘর। সবশুদ্ধ তিনটে ভাড়াটে এসেছে বাড়িতে; খালি নেই রাঘব হাজরার ফ্ল্যাট আর ঠিক তার নিচের তলার ফ্ল্যাট। খালি রয়েছে তারও ওপরের দোতলা আর নিচের তিনতলা।

প্রথম নজরেই একটা দারুণ চিত্তাকর্ষক জিনিস চোখে পড়ে আপিস-ফ্ল্যাটের এই বিশাল টাওয়ারে। এখানে-সেখানে কিছু বাঁশের ভারার ওপর থেকে চোখ পিছলে গিয়ে আটকে যায় রাঘব হাজরার ফ্ল্যাটের ঠিক ওপরের তলায়। সোনালী গিল্টি করা একাণ্ড একটা মানুষের চোখ। চারপাশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সাতটি সোনালী রশ্মি। দুটো তিনটে অফিসের জানলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেই রশ্মি।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ফাদার মণ্ডল—"এটা আবার কি?"

"নতুন একটা ধর্ম," হেসে বলল রাঘব; "আমার ঠিক ওপরের তলায় থাকে লোকটা। নাম, নিমি। সে নাকি সূর্যবংশের বংশধর। সূর্যের উপাসক সে। নিজেকে বলে, 'সূর্যদেবের নতুন সাধক'। নিচের তলায় থাকে দুজন মেয়ে। টাইপিস্ট।"

ফাদার ঘনশ্যাম বলল—"পূজো করে করুক। সূর্য হল আর্যদের আদি উপাস্য দেবতা। আর্যজাতির বিভিন্ন শাখায় এঁর উপাসনা দেখতে পাওয়া যায়। ইনি গ্রীকদের হেলিওস, লাতিনদের সল, টিউটনদের টাইয়ার, ইরানীয়দের 'খুরসেদ'। সূর্য যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি সমস্ত স্থাবর আর জঙ্গম পদার্থের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু রাক্ষসের চোখের মত ঐ পেল্লায় চোখের মানেটা কী ?"

"নিমির মতে নাকি মানুষের মন যদি স্থির থাকে, তাহলে সবকিছুই সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব। তাই এ ধর্মের প্রতীক আকাশের সূর্য আর ঐ চোখ। নিমি বলে, যে লোক সত্যিকারের স্বাস্থ্যবান, সে সূর্যের দিকে পাতা না ফেলে তাকিয়ে থাকতে পারে।"

"যে লোক সত্যিকারের স্বাস্থ্যবান"—বলল ফাদার, "সে সূর্যের দিকে তাকানো নিয়ে মাথা ঘামায় না।"

"নিমি বলে, তার এই নতুন ধর্ম মেনে চললে যে কোনো রোগ সেরে যায়।"

"আত্মিক রোগ ?" ফস করে প্রশ্ন করল ফাদার মণ্ডল।

"আত্মিক রোগটা আবার কী ?" জানতে চাইল রাঘব।

কিন্তু আত্মিক রোগটা কী, তা ব্যাখ্যা করার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না ঘনশ্যাম পাদরীর। রাঘবও সে বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না। কারণ নিচের তলা নিয়েই তার যা কিছু কৌতূহল—ওপরতলা নিয়ে নয়। ধর্ম-টর্মের ব্যাপারে কোনোদিনই উৎসাহ বোধ করে না রাঘব হাজরা। তার উৎসাহ মানুষ নিয়ে: আর সে মানুষ যদি সুন্দর হয় তাহলে তো কথাই নেই। নিচের তলার দুই যুবতীও মোটামুটি ডানাকাটা পরী। একজন দীর্ঘকায়, ঋজু, ছিপছিপে। ধারালো নাক, চিবুক আর গালের হনু। তরবারির মতই শাণিত সেই মূর্তি দেখলে সবার আগে একটা কথাই মনে আসে ; নিজের ধারে জীবনযুদ্ধে যারা পথ করে নিয়েছে—এ রূপসী তাদেরই

অন্যতম। অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল তার দুই চোখ—কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য হীরের নয়, ইস্পাতের। বিস্ময়কর সতেজ তার দেহলতা, কিন্তু কেমন জানি আড়ষ্ট। ছোট বোন যেন তারই ছোট্ট ছায়া—ছায়ার মতই একটু নিষ্প্রভ, ফ্যাকাশে। দুজনেই সাদাসিদে পোশাক পরতে ভালবাসে ; অফিস-আদালতের মেয়েরা যেমন পরে। নিচের তলার পুরো আপিসটা দেখাশুনা করে স্থিরবিদ্যুতের মত এই দুই বোন।

বড়বোনের নাম মায়াবতী। ছোটর নাম মাধবী। অর্থের অভাব নেই মায়াবতীর। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কুবেরের সম্পদ খরচ করার নানারকম পথ সে আবিষ্কার করেছে। একটা পথ, টাইপরাইটার নিয়ে আপিস খুলে বসা। আর একটা পথ হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েদের টাইপরাইটিং শিখতে সাহায্য করা। এইভাবে মুঠো মুঠো টাকার অপচয় করার ব্যাপারে একমাত্র বোন মাধবীর কতখানি মত আছে তা কেউই জানে না। মনে তাঁর যাই থাকুক, বাইরে কোনদিন তার প্রকাশ ঘটেনি। দিদি বলতে সে অজ্ঞান। এমন ন্যাওটা বোন বড় একটা দেখা যায় না। দিদির কাঠিন্য তার চেহারায় অনেকটা কম ; সে জায়গায় আছে বিষাদ। চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ট্র্যাজেডীর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে দিয়েছে মাধবী মল্লিক।

মায়াবতী মল্লিক অবশ্য অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। বিষাদ জিনিসটা যেমন তার ধাতে নেই, তেমনি নেই সহিষ্ণুতা আর পরনির্ভরতা। প্রথম আলাপেই বেশ মজা পেয়েছিল রাঘব হাজরা। একই সঙ্গে লিফটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। কিন্তু লিফ্টম্যান নিপাত্তা দেখে রাঘব বলেছিল দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে যেতে—তার মধ্যেই এসে যাবে ছোকরা। কিন্তু মাটির ওপর পা ঠুকে ফুঁসে উঠল মায়াবতী। লিফ্ট চালানো তার জানা আছে। আর এই সামান্য কাজের জন্যে দায়িত্বজ্ঞানহীন পুরুষের মুখ চেয়ে থাকার

পাত্রী সে নয়। বলে, গটগট করে ভেতরে ঢুকে লিফ্ট চালিয়ে দিয়েছিল। অগত্যা রাঘবকেও উঠতে হয়েছিল। তিনটে তলা পেরিয়ে চারতলায় লিফট দাঁড়াতেই দরজা খুলে ধরেছিল রাঘব। কিন্তু তাতেও বিরক্তি। যেন পুরুষের এটুকু অযাচিত সাহায্যও তার অসহ্য। দেখে-শুনে মনে মনে একচোট হেসে নিয়েছিল রাঘব।

মায়াবতীর বদরাগী মেজাজের পরিচয় পাওয়া গেছিল আর একদিন। কয়েকটা কাগজপত্র টাইপ করানোর জন্যে হঠাৎ নিচের তলার আপিসে ঢুকে পড়েছিল রাঘব। ঢুকেই চোখ পড়ল দৃশ্যটা।

ছোটবোন মাধবীর চোখ থেকে একটা চশমা টেনে নিয়ে ঘরের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মায়াবতী। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দমাদম লাথি মারছে চশমাটার ওপর। 'জঘন্য ডাক্তারী ধারণা' জাতীয় কি সব কথা গড় গড় করে বলে যাচ্ছে সেইসঙ্গে। এ ধরণের যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া মানেই নিদারুণ অসুস্থ দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া। মাধবী যেন আর এজাতীয় কৃত্রিম অস্বাস্থ্যকর জঞ্জাল এ বাড়িতে না আনে। চশমাই যদি এত প্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে তো কাঠের পা, শণের চুল, কাঁচের চোখও তার প্রিয় হওয়া উচিত। মাধবী কি এসবেও রাজী আছে? বলতে বলতে স্ফুলিঙ্গ ছিটোতে লাগল মায়াবতীর প্রদীপ্ত দুই চোখ—ভয়ানক কৃষ্ট্যালের মতই।

একী উন্মাদ ধারণা! হতভম্ব হয়ে গেছিল রাঘব। কথাটা না জিগ্যেস করেও পারেনি। চশমা পরাই যদি এতখানি দুষ্ট দুর্বলতা হয়, তাহলে সিঁড়ি থাকতে লিফটে ওঠাটা কি হওয়া উচিত?

তেজালো স্বরে তক্ষুনি বলেছিল মায়াবতী—"রাঘববাবু, মোটর, ব্যাটারী, লিফ্ট—এগুলো খাঁটি বিজ্ঞান। সময়কে এরা সংক্ষিপ্ত করছে, দূরত্বকে কমিয়ে আনছে। এরা পুরুষের শক্তি—নারীরও তাই। কিন্তু চশমা হল মেডিক্যাল ধাপ্পাবাজী; মানুষকে আরও

অসহায় করে তোলার প্রচেষ্টা। ফলে নিজের শক্তির ওপরেও তার আস্থা, তার ধারণা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। অনেক সময়ে বাচ্চাদের সূর্যের দিকে তাকাতে বারণ করা হয়। কেন? মানুষ কি সূর্যের দাস? আকাশের কোটি কোটি তারার দিকে তাকাতে পারি, আর ঘরের তারার দিকে তাকালেই যত বিপদ? ছেলেবেলা থেকে এইভাবে মনের মধ্যে যদি ভয় ঢুকিয়ে না দেওয়া হয় তাহলে, মানুষ সমান তেজে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে।”

চমৎকৃত হয়ে রাঘব শুধু বলেছিল—“আপনার চোখ সূর্যকেও ধাঁধিয়ে দেবে।” বলে, ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল রাঘব। অবাক হয়েছিল এই কথা ভেবে যে এমন স্বাবলম্বী রূপসীরাও শেষে ওপর তলার বুজরুক সূর্যসাধক নিমির খপ্পরে পড়ল।

নিমিকে বুজরুক বলাও মুস্কিল। এরকম ব্যক্তিত্বময় পুরুষ বড় একটা চোখে পড়ে না। মাথায় সে রাঘবের মতই লম্বা। কিন্তু অনেক বেশী সুন্দর। গ্রীক নাক, টুকরো হীরের মত জ্বলজ্বলে পিঙ্গল চোখ, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, মাথায় লম্বা-লম্বা বাবরি চুল। রাজপুত রাজাদের মত দৃপ্ত, গৌরবর্ণ সে মুখশ্রী দেখলে সাধারণ লোকের মাথা আপনা থেকেই নুয়ে আসবে। আর বুদ্ধিমান পুরুষ চমৎকৃত হবে তার মুখের ধীশক্তি আর প্রজ্ঞা দেখে। গোড়ালী পর্যন্ত দুধের মত ধবধবে সাদা আলখাল্লা পরে ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যের স্তব করার সময়ে পথচারীর মুখের হাসি মিলিয়ে যেত; স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত দেবদূতের মত সেই অপরূপ মূর্তির দিকে। দিনে তিনবার সূর্যের স্তুতি পাঠ করত সূর্যসাধক নিমি। সূর্যোদয়ের সময়ে, সূর্যাস্তের সময়ে আর দ্বিপ্রহরে। সেদিনও ঠিক দুপুরবেলা ছোট্ট বারন্দায় আত্মসমাহিত সেই শ্বেতশুভ্র মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়াল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

রাঘব কিন্তু দাঁড়ালো না। দিনের পর দিন এই একই দৃশ্য

দেখে দেখে চোখ তার পচে গেছে। কাজেই মুখভঙ্গী করে হনহন করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর।

মাথার ওপর দুহাত তুলে দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে তখন স্তব করছে নিমি। নিচ থেকে অবাক বিস্ময়ে মিটমিট করে ওপরে তাকিয়ে রইল ফাদার মণ্ডল। ঘনশ্যাম পাদরী চোখ মিটমিট না করে কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু চারতলার সূর্যসাধক যেন মনে হল চোখের পাতা একবারও না কাঁপিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জ্বলন্ত সূর্য গোলকের দিকে। কিন্তু ঠিক সূর্যের দিকেই কি? খালি চোখে তা তো সম্ভবই নয়।

"হে আদিত্য," ভরাট গম্ভীর গলায় বলছিল নিমু। জনবহুল পথেও ভেসে আসছিল তার গমগমে কণ্ঠস্বর। "আলোকোদ্ভাসিত আকাশ তোমার মুখ, সূর্যমণ্ডল তোমার চোখ, তুমি হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী, বিশ্বভুবনের চর, মর্ত্যজনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী, সপ্তাশ্বযোজিত একচক্র রথে তুমি বিশ্ব-পর্যটক, যে বিশ্বের তুমি স্রষ্টা—"

আচম্বিতে রক্তজমানো প্রচণ্ড শব্দে কী যেন আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘন-ঘন আর্ত চীৎকারে চমকে উঠল প্রতিটি পথচারী। বিদ্যুৎবেগে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এল তিনজন লোক এবং ততোধিক বেগে ঢুকে পড়ল পাঁচজন। প্রত্যেকের চীৎকারেই প্রত্যেকে কিছুক্ষণের জন্য বধির হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ছোটখাট ভিড় জমে গেল বাড়ির সামনে। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে নির্বিকার রইল শুধু দুজন পুরুষ। ফুটপাতের ওপর ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। আর চারতলার বারান্দায় সূর্য-সাধক নিমি। এতটুকু বিরাম ঘটল না তার উদাত্ত কণ্ঠের সূর্যস্তবে। এতক্ষণে ফাদার বুঝতে পারল, মুখটা তার ওপরের দিকে বটে, কিন্তু দৃষ্টি রয়েছে সূর্য থেকে ঈষৎ পশ্চিমে।

এই সময় বিশাল পাহাড়ের মত বেরিয়ে এল রাঘব হাজরার

দৈত্যমূর্তি। নিমেষে জনতাকে শান্ত করে পুলিশে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করলে সে। তারপর ফিরে গেল বাড়ির ভেতরে। নিমির স্তব শুনতে শুনতে পেছন পেছন গুটি-গুটি ঢুকে পড়ল পাদরী মণ্ডল।

লিফটে নেমে এসে যেখানে দাঁড়ায়, সেই ঘেরা জায়গায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাঘব হাজরা, ফাদার মণ্ডল এবং আরও ছজন পুরুষ। লিফটের বদলে স্বল্প পরিসর জায়গাটায় নেমে এসেছিল যে দেহটি এখন আর তাকে চেনবার উপায় নেই। থেঁতলানো, রক্তমাখা সেই বীভৎস দেহ দেখলে পাথরের চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। রাঘব হাজরার চিনতে ভুল হয়নি। মায়াবতী মল্লিককে সহজে ভোলা যায় না। ডাক্তার ডাকতে পাঠালেও রাঘব জানত রুধিররঞ্জিত সে দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

একি আত্মহত্যা? কিন্তু বিষাদ শব্দটা তো মায়াবতীর অভিধানে ছিল না? তবে কি খুন? প্রায় জনহীন এতবড় ফ্ল্যাট-বাড়িতে কার অন্তর বিষিয়ে উঠল খুনের বিষে? নিমি? কিন্তু সে তো পনেরো মিনিট ধরে একনাগাড়ে সূর্যসাধনায় তন্ময়। তখনও শোনা যাচ্ছে তার মেঘমন্দ্র কণ্ঠের স্পষ্ট উচ্চারণ।

হঠাৎ কাঁধের ওপর হাত পড়তেই চট করে ঘুরে দাঁড়াল রাঘব। ফাদার মণ্ডল। চোখে তার স্থির দৃষ্টি।

“কিন্তু সে তো বারান্দায়।” যেন নীরব প্রশ্নেরই উত্তর দিল রাঘব।

“চল, ওপরে গিয়ে দেখা যাক। পুলিশ আসতে এখনও আধ ঘণ্টা দেরী,” শান্ত কণ্ঠে বলল পাদরী মণ্ডল।

কিন্তু চারতলার আপিসঘর শূন্য। টাইপরাইটারের সামনের চেয়ার খালি। ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এসে বললে রাঘব—“ছোটবোন মাধবী মল্লিক বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছেন।”

“ওপরেও যেতে পারেন। হয়ত সূর্যসাধকের ঘরেই গেছেন কোন কাজে। আমি বরং এইখানেই বসি, তুমি যাও।”

বলে, মল্লিক-বোনদের শূন্য আপিসঘরের একটা লাল কুশন-আঁটা চেয়ার টেনে এনে দরজার সামনে বসল ফাদার মণ্ডল। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল চাতাল আর সিঁড়ির দিকে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল পর পর তিনটি মূর্তি। প্রথমজন মায়াবতী মল্লিকের ছোট্ট ছায়া মাধবী মল্লিক, দ্বিতীয়জন সূর্য-সাধক নিমি স্বয়ং—সাদা আলখাল্লা দুলিয়ে সমস্ত সিঁড়ি যেন আলো করে নেমে এল সে প্রশান্ত সৌম্য মুখে। তৃতীয় জন রাঘব হাজরা—দুই চোখে তার বিমূঢ়তা।

কোন সন্দেহই নেই—তিনজনেই আসছে নিমির সাময়িক সূর্যমন্দির থেকে।

ঘরে ঢুকে সিধে নিজের টেবিলের সামনে এগিয়ে গেল মাধবী মল্লিক। রোলার ঘুরিয়ে টাইপরাইটারে নতুন কাগজ ঢুকিয়ে বসল চেয়ারে। রাঘব হাজরা স্তম্ভিত হয়ে গেল তার নির্বিকার শান্ত হাবভাব দেখে। একটা কালো সন্দেহও উঁকি দিল মনের কোণে।

অকস্মাৎ বলল পাদরী মণ্ডল—“স্বামীজী, আপনার নতুন ধর্ম সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য আছে। কিন্তু সে আলোচনা পরে করলেও চলবে। আপাতত আজকের শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধে আপনার মুখে কিছু শুনতে পারি কি ?”

“কি শুনতে চান ?”

“কিভাবে খুন হলেন মায়াবতী মল্লিক।”

আচমকা যেন ঘরের বাতাসও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আশ্চর্য নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। ধীরে ধীরে বুক চিতিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল সূর্যসাধক নিমি। যেন সত্যিই নতুন সূর্য উঠল ঘরের মধ্যে। মেঘ-ডাকার মত বিস্ময়কর গমগমে গলায় বলল—“হত্যার অপরাধটা আমার কাঁধেই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন মনে হচ্ছে ?”

“চাপিয়ে দিচ্ছি না, আত্মরক্ষার একটা সুযোগ দিচ্ছি,” ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল ফাদার মণ্ডল।

স্থির অপলক চোখে ঘনশ্যাম পাদরীকে যেন বিঁধে ফেলতে চাইল নিমি। হীরের টুকরোর মত প্রদীপ্ত দুই চোখে ঘনিয়ে উঠল অপরিসীম তাচ্ছিল্য।

বলল মেঘমন্দ্র কণ্ঠে—‘ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। আমি চাইছি মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত করতে। আর আপনি চাইছেন তা কলঙ্কিত করতে। আমি মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইছি—আপনি চাইছেন তা ধ্বংস করতে। ছিঃ ফাদার, ছিঃ।”

নীরবে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে বসে রইল ফাদার মণ্ডল।

সৌম্য মুখে নিঃসীম বেদনা ফুটিয়ে তুলে আবার শুরু করল সূর্য-সাধক—“ফ্ল্যাটে গেলেই একটি ছেলেকে দেখবেন বাইরের ঘরে বসে আছে। আমার সবকিছুই দেখাশুনা করে সে। ভদ্র ঘরের ছেলে। তার মুখেই শুনবেন, বারোটা বাজার ঠিক দশমিনিট আগে ফ্ল্যাটে ফিরে গেছিলাম আমি। রোজকার মত ঠিক বারোটায় বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম—বারোটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত স্তব করেছি। রাস্তার লোকেও তার সাক্ষী আছে। মায়াবতী মল্লিক মারা গেছেন বারোটা পাঁচ মিনিটের সময়ে।

“আর একটা জিনিস আপনার জেনে রাখা দরকার। মায়াবতী আমার বিয়ে-করা বউ। সে বিয়ে হয়েছে সূর্যকে সাক্ষী রেখে। শুধু তাই নয়। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেই উইল লিখেছে সে। উইলে তার বিশ লাখ টাকার একমাত্র ওয়ারিশ করেছে আমাকে। টাকাটা খরচ হবে আমার এই নতুন ধর্মের প্রচারে। ঐ টেবিলে বসে উইলটা লিখছিল মায়াবতী। তাই দেখে আমিও ওপরে চলে যাই।

“ফাদার, এখনও কি আপনার ধারণা, নিজের বউকে খুন করা

আমার পক্ষে সম্ভব ? ছিঃ ফাদার, ছিঃ, মানুষকে এত সঙ্কীর্ণ, এত স্বার্থপর ভাবেন কী করে ?”

অধোবদনে আগাগোড়া বসেছিল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। মুখ দেখে মনে হল যেন নিদারুণ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারলে সে বাঁচে। কোঁচকানো ললাটের ভাঁজে ভাঁজে সীমাহীন সেই অন্তর্বেদনা আর গ্লানি দেখে অবাক হয়ে গেল রাঘব হাজরা। ফাদার ঘনশ্যামকে এই প্রথম পরাজিত হতে দেখলে সে। কি শোচনীয় পরাজয় !

সূর্য-সাধকের তীব্র তিরস্কার হজম করতেই খানিক সময় গেল। তারপরেও মুখ তুলতে সাহস পেল না পাদরী। থমথমে স্বব্ধতা ভঙ্গ করে মিয়োনো গলায় বললে কোন মতে—“বেশ তাই যদি হয় তাহলে উইলটা বরং আপনি নিয়ে যান। ভাল কথা, শেষবার যখন আপনি ওঁকে দেখেন তখন দরজা খোলা ছিল নিশ্চয়ই ?”

“তা ছিল।”

“এখনও পর্যন্ত তা খোলাই রয়েছে,” শুকনো মুখে বলল ফাদার: “যান, উইলটা নিয়ে যান। উনি সঙ্গে নিয়ে যাননি তো ?”

“টেবিলের ওপর একটা কাগজ রয়েছে বটে,” বলতে বলতে এগিয়ে গেল মাধবী। নীলাভ রঙের এক তা পুরু দামী কাগজ তুলে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। ধীরে ধীরে বিচিত্র শ্লেষলিখা হাসি ফুলে উঠল ওষ্ঠপ্রান্তে। নিতান্ত অসময়োচিত সেই রহস্যাবৃত হাসি দেখে ভ্রূকুটি করল রাঘব হাজরা।

দেবদূতের মতই জ্যোতিঃপূর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইল নিমি। নিরাসক্ত নির্বিকার সেই দৃষ্টির মধ্যে পার্থিব ভোগ-লালসার ছায়াও দেখা গেল না।

অগত্যা এগিয়ে গেল রাঘব। মাধবীর হাত থেকে কাগজটা তুলে নিলে। চোখ বুলোবার পর কিন্তু নিবিড় বিস্ময় ফুটে উঠল

চোখের তারায়। উইল যেভাবে লেখা হয়, ঠিক সেইভাবেই শুরু হয়েছে প্রথমটা।

কিন্তু "আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি" পর্যন্ত আসার পরেই খানিক আঁচড় ছাড়া আর কিছুই নেই। নাম নেই ওয়ারিশের। সই নেই মায়াবতীর।

নীরবে পাদরী মণ্ডলের হাতে মণ্ডলের হাতে অসমাপ্ত উইলটা তুলে দিল রাঘব। একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাগজটা সূর্যসাধকের হাতে গুঁজে দিল ফাদার।

পলক পড়তে যেটুকু সময় গেল—পরক্ষণেই তিন লাফে গোটা ঘরটা পেরিয়ে এল, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চোখধাঁধানো বিশাল মূর্তি—মাধবী মল্লিকের ওপর ঝুঁকে পড়ে পিঙ্গল চোখে আগুন জ্বেলে বললে ভয়ানক চাপা কণ্ঠে—"শয়তানী! নিশ্চয় তোর কারসাজি! মায়াবতী সব কথা কেন লেখেনি? কি করেছিস তুই?"

ঘরশুদ্ধ লোক চমকে উঠল এই নতুন কণ্ঠ শুনে। গুরুগম্ভীর মার্জিত স্বরের পরিবর্তে একি কর্কশ হুমকি!

যেন চকিতে খসে গেল মহিমার মুখোস—বেরিয়ে এল ভয়দেখানো বিভীষিকা।

কেউটে সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল নিমি—"শেষে দিদিকে খুন করলি তুই? আপনারা সবাই শুনুন। মায়াবতী উইলে আমার নাম লিখছিল—কিন্তু এই কুচক্রী মেয়েটার তা সহ্য হয়নি। হাত থেকে কলম ছিনিয়ে নিয়েছে—তাই এই আঁচড়। তারপরেই জোর করে টেনে এনে ফেলে দিয়েছে লিফটের গর্তে। খুনী চাইছিলেন—এই সেই খুনী!"

এতটুকু বিচলিত না হয়ে অদ্ভুত শান্ত স্বরে জবাব দিলে মাধবী নিজেই—"একটু আগেই বললেন না আপনার দেখাশুনা করে যে সে ভদ্রঘরের ছেলে? দয়া করে তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানবেন, দিদি নিচে আছড়ে পড়ার পাঁচ মিনিট আগে থেকে

পাঁচ মিনিট পরে পর্যন্ত আমি আপনার ফ্ল্যাটেই ছিলাম টাইপের কাজ নিয়ে। তাছাড়া রাঘববাবুও আমাকে ওপরতলা থেকেই ডেকে এনেছেন।" সব চুপ। নিঃশ্বাস ফেলারও শব্দ শোনা যায় এমনি সেই নৈঃশব্দ্য।

"মায়াবতী মল্লিক একলাই যদি থাকেন, তাহলে উনি আত্মহত্যা করেছেন!" বললে রাঘব।

"মায়াবতী মল্লিক একলা ছিলেন। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেননি।" জবাব দিলে ফাদার মণ্ডল।

"তাহলে মৃত্যু হল কি করে?" অসহিষ্ণু কণ্ঠ রাঘবের।

"তাঁকে খুন করা হয়েছে।"

"কিন্তু উনি একলা ছিলেন," নাছোড়বান্দা রাঘব হাজরা।

"একলা থাকার সময়েই খুন করা হয়েছে" নির্বিকার কণ্ঠ ফাদার মণ্ডলের।

মিনিটখানেক আর কোনো কথা জোগালো না রাঘব হাজরার রসনায়। বিমূঢ় চোখে শুধু তাকিয়ে রইল তখনও অধোবদন ফাদার মণ্ডলের দিকে। কপালের ভাঁজে তার আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে হৃদয়-বেদনা।

আচমকা বাজের মত হুংকার দিকে উঠল নিমি—"আপনারা পুলিশে খবর দিয়েছেন কিনা শুনতে চাই। অর্থপিশাচ এই মেয়েটা শুধু দিদিকেই খুন করেনি, আমার বিশ লাখ টাকাও আত্মসাৎ করেছে—"

"থামুন, থামুন," বিরক্তকণ্ঠে বললে রাঘব হাজরা, "টাকার লোভ কার নেই?"

"বিশ লাখ টাকা যাওয়ার জন্যে আমি কাতর নই, যদিও সে টাকায় দুনিয়ারই উপকার হত। কিন্তু মায়াবতীর ধ্যান-ধারণা যে তাই ছিল। এছাড়া আর কোনা স্বপ্নই তার ছিল না। তার চোখে—"

আচম্বিতে ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। ছিটকে গিয়ে দাঁড়াল নিমির সামনে। এতক্ষণ পরে এই প্রথম সিধে সূর্য-সাধকের পিঙ্গল চোখে চোখ রাখল; মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখে গর্জে উঠিল রুদ্ধকণ্ঠে—"এই শব্দটাই চাইছিলাম; ওঁর চোখ; জঘন্যতম অপরাধ করেছেন আপনি। কিন্তু সব সূত্র লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর চোখে। বলুন, কি ছিল তাঁর চোখে—"

পিগমির মত বামন পাদরীর সামনে কেঁচোর মত কুঁচকে সরে গেল নিমির অতবড় দানবমূর্তি—"কী চান, কী বলতে চান? সরে যান, সরে যান সামনে থেকে!" বলতে বলতে পিছিয়ে গেল সাপ দেখে চমকে ওঠার মতই।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে একই রকম ভয়াল স্বরে গর্জে উঠল পাদরী—"বলুন, সবার সামনে বলুন—কি ছিল তাঁর চোখে—"

"পাগল! আপনি শয়তান! যেতে দিন, আমাকে যেতে দিন—" বলতে দরজার দিকে ছুটে গেল নিমি।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে পা বাড়িয়ে বলল রাঘব হাজরা—"ধরব নাকি?"

"না," পাঁজরখালিকরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল পাদরী মণ্ডল; যেন বিশ মণ পাথর নেমে গেল, এমনিভাবে বুকের অন্তস্থল থেকে নিঃশ্বাস ফেলে অনেকটা সুস্থ হল ফাদার। বলল—"যেতে দাও। যে দেশে সূর্য নেই, সেখানেই শেষ পর্যন্ত যেতে হবে ওকে।"

ক্ষণপরেই সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল পদশব্দ।

আর একমনে যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল মাধবী মল্লিক।

রাঘবের আর উৎকণ্ঠা সহ্য হল না। বোমার মত ফেটে পড়ে জিজ্ঞেস করল—"ফাদার, শুধু কৌতূহল নয়, আমার কর্তব্যের খাতিরেও এ ক্রাইমের ব্যাখ্যা শুনতে চাই।"

"কোন ক্রাইমটা ?"

"আজ যা ঘটল।"

"ক্রাইম তো একটা নয়—দুটো। দুটোর গুরুত্ব দুরকম। ক্রিমিন্যালও দুজন।"

কাগজ গুছোনো শেষ করে ড্রয়ারে চাবি দিলে মাধবী। ফাদার সম্বন্ধে সে যতখানি উদাসীন, তার সম্বন্ধেও ফাদারকে ততখানি উদাসীন দেখা গেল। কারোর দৃষ্টি কারো দিকে নেই। অথচ···

"দুটো ক্রাইম দুরকম," বললে ফাদার ঘনশ্যাম; "কিন্তু উদ্দেশ্য এক। একই ব্যক্তির একই দুর্বলতাকে অবলম্বন করে তারই বিশ লাখ টাকা আত্মসাৎ করাই হল সেই উদ্দেশ্য! বড় ক্রাইমের ক্রিমিন্যাল ছোট ক্রাইমের ক্রিমিন্যালের এক প্যাঁচেই হল কুপোকাৎ। ফলে, ছোট ক্রাইমের ক্রিমিন্যাল পেয়ে গেল পুরো টাকাটা।"

"দোহাই ফাদার", গুঙিয়ে উঠল রাঘব "অল্প কথায় বলুন।"

"অল্প কেন, একটা কথাতেই বলতে পারি," বললে ফাদার।

ড্রয়ারে চাবি দিয়ে আপন মনেই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাধবী। চুল ঠিক করে নিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগটা ঝুলিয়ে নিলে। তারপর ধীরপদে কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে খুট খুট করে বেরিয়ে গেল বাইরে। "এক কথায় এ রহস্যের ব্যাখ্যা হল এই," বললে ফাদার মণ্ডল। "মায়াবতী মল্লিক অন্ধ ছিলেন।"

"অন্ধ!"

"জন্মাবধিই চোখ খারাপ তাঁর। বোনেরও তাই। কিন্তু দিদির দাপটে চশমা নিতে পারে নি। অদ্ভুত জেদ ছিল মায়াবতীর। চশমা-টশমা বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন নেচার কিওর আর আত্মার শক্তিকে। ইচ্ছাশক্তিকে। এই সময়ে জুটল এই সূর্যসাধক। চোখের যেটুকু বাকী ছিল। তাও নষ্ট করে দেওয়া হল সূর্যের দিকে তাকানোর অভ্যেস করিয়ে। তারপরেই খুন

করা হল তাঁকে। খুব সহজ খুন। রাঘব, তুমি দেখেছ তো এ বাড়ির লিফ্‌ট্ কত নিঃশব্দে ওঠানামা করে। নিমি, আর মায়াবতী দুজনেই লিফ্‌ট্ চালাতে জানত। আজ বারোটার আগে লিফ্‌ট্‌টাকে দরজার সামনে আনল নিমি—খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল তখনও উইল লিখছেন মায়াবতী! লিফ্‌ট্ থেকেই হেঁকে উঠে বলল নিমি—'লিফট রইল। লেখা শেষ করে ওপরে এস।' বলে, বোতাম টিপে নিঃশব্দে লিফ্‌ট্ নিয়ে উঠে গেল ওপরে। মায়াবতী কিছুই জানতে পারলেন না। নিমি যখন বারান্দায়, মায়াবতী তখন খুশী মনে প্রিয়তমের কাছে যাওয়ার আশায় ছুটে এল লিফটের দিকে। পা বাড়াতেই—"

"উঃ! কি পিশাচ!" চোয়ালের হাড় শক্ত করে বলল রাঘব।

"কিন্তু বোতাম না টিপলে তো বিশলাখ টাকা পাওয়া যায় না। কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল আর একজনের নষ্টামিতে। মাধবী মল্লিকেরও বিশ লাখ টাকার দরকার। দিদির চোখের রহস্যও তার জানা।

"উইলের একটা জিনিস তোমরা কেউ লক্ষ্য করো নি। যদিও তলায় মায়াবতীর সই নেই, কিন্তু জানাশুনো কয়েকজনের সাক্ষী হিসেবে সই আছে। অর্থাৎ দিদিকে সে নিশ্চয় বুঝিয়েছিল, সব তৈরী রইল। এখন শুধু তার সই হলেই সব শেষ। সত্যিই সব শেষ করতে চেয়েছিল মাধবী। তাই দিদিকে একলা বসিয়ে রেখে গেছিল এ ঘরে। সাক্ষীদের সই দেখেই ধরেছিলাম, এ উইলে দিদি সই করুক, এ রকম কোনো ইচ্ছেই ছিল না মাধবীর।

"দুই বোন ফাউন্টেন পেনে লেখেন। আশ্চর্য হচ্ছে এই যে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও মায়াবতী কিছুতেই স্বীকার করতে চাইতেন না তা। তাই স্রেফ মনোবল আর অভ্যেসের জোরে স্বাভাবিক রেখেছিলেন তার সব কাজ। লেখার ব্যাপারেও তাই। স্পষ্ট দেখতে পেলে মানুষ যেভাবে লেখে, আন্দাজে সেইভাবেই লিখতে

পারতেন মায়াবতী। লিখতেন ঠিকই। কিন্তু কখন কলমে কালি ফুরোচ্ছে, তা টের পেতেন না। কলমে কালি ভরে দেওয়ার কাজ করে দিত সহোদরা মাধবী। ভরেনি শুধু এই কলমটি। অথবা, এমন হুঁশিয়ার হয়ে ভরেছিল যাতে মাঝপথেই কালি ফুরিয়ে যায়। হলও তাই। কয়েক লাইন লেখবার পরেই কালি ফুরোলো। ফলে, বিশ লাখ টাকা হাত ফস্কে গেল নিমির। অথচ, অত্যন্ত নির্মমভাবে খুন হয়ে গেলেন নিরীহ মায়াবতী।”

“ফাদার, সমস্ত রহস্যটা বুঝতে আর খুনী কে তা জানতে নিশ্চয় আপনার দশ মিনিটও যায় নি, তাই না?”

“আরে না না, খুনী কে, তা আমি এ বাড়িতে ঢোকার আগেই জানতাম। দশ মিনিট লেগেছে শুধু মাধবী আর ফাউন্টেন পেনের রহস্য বুঝতে।”

“ঠাট্টা করছেন নাকি?”

“সিরিয়াসলি বলছি। খুনের খবর শোনার আগেই জানতাম এ কাজ নিমির।”

“তাই কি সম্ভব?”

“প্রথম কথা, নিমি কখনোই সূর্যের দিকে তাকাত না। তারপর আছাড়ের শব্দ আর ঘন ঘন চীৎকারে রাস্তায় অত লোক দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু সূর্যসাধক একবারও ফিরে তাকালে না। দেখেই বুঝলাম, সে জানত এরকম কিছু একটা ঘটবে।”

প্লেটে দইবড়া সাজানোই ছিল। অনুবৌদির নিজের হাতে তৈরী অনবদ্য দইবড়া। গল্প শেষ হতেই তা হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর এল কফি।

সেই সঙ্গে শুরু হল আরেক চমকপ্রদ কাহিনী—‘হত্যার তিন হাতিয়ার’।

মৃত্যু যে মানুষকে মহিমান্বিত করে তোলে, এ সত্য আমরা

প্রায় সকলেই জানি। কিন্তু এ বিষয়ে ফাদার মণ্ডলের প্রতীতি এবং পেশালব্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকের চাইতে বেশী। তা সত্ত্বেও সেদিন ভোরে ডক্টর প্রতাপসিংহ ভৌমিক খুন হয়েছেন শুনে অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করল ফাদার। ডক্টর জনপ্রিয় মানুষ। নানাভাবে জনসাধারণের মধ্যে আমোদ বিতরণ করেছেন তিনি। এজন্যে মধ্যে মধ্যে কমেডিয়ান আখ্যাও লাভ করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাতে তিনি দমে যাননি বিন্দুমাত্র। পরোপকারী হিসেবেও ডক্টর ভৌমিকের সুনাম ছিল যথেষ্ট। কায়েমী আসন করে নিয়েছিলেন সমাজের দীন-হীন-নিঃস্ব শ্রেণীর অন্তরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি ডক্টরেট হন সমাজকল্যাণ সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়কর গবেষণার জন্যে। কাজেই তাঁর মত বিরাট পুরুষ নিহত হয়েছেন শুনে ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল যদি অভিভূত হয়ে পড়েন, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শহর থেকে দূরে ছবির মত সুন্দর একটা বাড়িতে বাস করতেন প্রতাপসিংহ ভৌমিক। আধুনিক অট্টালিকা। খুব চওড়া নয়, তবে বেজায় উঁচু। গত্যময় গড়ন। সরু দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে এসে যেখানে শেষ হয়েছে, তার অনতিদূরে রেললাইন। প্রতিবার ট্রেন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কেঁপে ওঠে গোটা বাড়িটা। শক পাওয়া নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছিল বাড়িশুদ্ধ সকলের। কিন্তু সেদিন ভোরে পালা বদল হল। নিদারুণ শক পেল অতবড় ট্রেনটা।

আস্তে আস্তে কমে এল ইঞ্জিনের গতি। তারপর একেবারেই মিলিয়ে গেল লৌহনির্ঘোষ। যন্ত্রযান স্তব্ধ হতেই লাফিয়ে উঠল একজন পুরুষ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার কালো পোশাকে মোড়া। দূর থেকেই সবেগে হাত নাড়ছিল লোকটা। শুধু তার হাত নাড়ানো দেখলে হয়ত ট্রেন দাঁড়াতো না ; কিন্তু এমন বিকট অস্বাভাবিক চীৎকার বেরুচ্ছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে যে গাড়ি না

থামিয়ে আর পারেনি ড্রাইভার। "খুন, খুন" বলে চেঁচাচ্ছিল কৃষ্ণমূর্তি। তাই শুনেই ব্রেক কষেছিল ড্রাইভার।

ট্রেন থামতেই জানা গেল কালো পোশাক-পরা লোকটা ডক্টর প্রতাপসিংহ ভৌমিকের খাসভৃত্য—পল্টুলাল।

রেললাইনের পাশের গড়ানে জমি বেয়ে ওপাশে ঝোপের আড়ালে ছুটে গেছিল কয়েকজন উৎসাহী যাত্রী। পলিতকেশ বৃদ্ধের দেহ তারাই দেখতে পেল সবার আগে। বৃদ্ধের পায়ে জড়িয়ে ছিল একটুকরো ছেঁড়া দড়ি—সম্ভবত ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলেই ছিঁড়েছে দড়িটা। একটু আধটু রক্তও ছিল—খুবই সামান্য। কিন্তু যে রকম বীভৎস ভঙ্গিমায় পড়েছিল দেহটা, সে রকম কষ্টকর অবস্থায় কোনো জীবিত প্রাণীর পক্ষে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ক্ষণপরেই বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন চওড়া-কাঁধ এক বিশাল পুরুষ। এককালে ভারতীয় শিল্পরীতি নিয়ে শিল্পীমহলে দারুণ সাড়া এনেছিলেন ভদ্রলোক। উদ্দালক মিত্রকে তাই যাত্রীদের মধ্যে দু-একজনের চিনতে কোনো অসুবিধে হল না। পল্টুলালের মতই তাঁর চোখে মুখে বিহ্বল বেদনা। তার কয়েক সেকেণ্ড পরেই বেরিয়ে এল আরও একটি মূর্তি। তরুণী। রূপসী। ডক্টর প্রতাপসিংহ ভৌমিকের কন্যা—রিণা ভৌমিক।

ততক্ষণে ঘনঘন হুইশ্‌ল্ বাজিয়ে খুনের খবর নিয়ে অদূরবর্তী ষ্টেশনের দিকে হাঁপাতে হাঁপাতে রওনা হয়েছে ট্রেনটা।

উদ্দালক মিত্রের অনুরোধে ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলও নেমে এসেছিল। অবশ্য পুলিশ ইন্সপেক্টর পৃথ্বীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী না ডাকলে উদ্দালক মিত্রের আহ্বানে এত চটপট ফাদার ঘনশ্যাম সাড়া দিতেন কিনা সন্দেহ। পৃথ্বীন্দ্রনাথ রাঘব হাজরার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর, রাঘব হাজরার ঘনিষ্ঠ হতে গেলে ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলের অসংখ্য প্রশস্তি কাহিনী না শুনে নিস্তার নেই। কাজেই পৃথ্বীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলে না ফাদার ঘনশ্যাম।

তরুণ ইন্সপেক্‌টরের সঙ্গে গুটি গুটি এগোলো বাড়িটার দিকে।

যেতে যেতেই বলছিল পৃথ্বীন্দ্রনাথ—“আমি তো মশাই মাথামুণ্ডু বুঝছি না। সন্দেহ করার মত একজনও নেই এ-বাড়িতে। পল্টুলাল একান্ত বিশ্বাসী—আর পয়লা নম্বরের উজবুক। খুন করার মত বিটলেমো ওর দ্বারা সম্ভব নয়। উদ্দালক মিত্র ডক্টর ভৌমিকের শুধু সেক্রেটারী নন, দীর্ঘকালের বন্ধু। রিণা ভৌমিকের সঙ্গেও তাঁর বিলক্ষণ সম্প্রীতি রয়েছে। তাছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটাই এমন অবিশ্বাস্য যে বলে বোঝাবার মত নয়। ডক্টর ভৌমিকের মত হাসিখুশী পাকাচুল মানুষকে খুন করাবার স্পৃহা কার থাকতে পারে, তা এক রহস্য।”

“বাড়িটাও হাসিখুশীই বটে,” সায় দিল ফাদার মণ্ডল। “যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন হাসিখুশী ছিল এ বাড়িতে। বলতে পারেন, মৃত্যুর পর সে হাসিখুশী এখনও আছে কিনা?”

মূহূর্তের জন্যে অপলকে তাকাল পৃথ্বীন্দ্রনাথ। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুই চোখ।

3338

“মৃত্যুর পর হাসিখুশী!” থেমে থেমে পুনরাবৃত্তি করল পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

“হ্যাঁ,” একই রকম বুদ্ধিহীন নিরেট স্বরে বললে বেঁটে ঘনশ্যাম। “হাসিখুশী ছিলেন ডক্‌টর ভৌমিক। কিন্তু সে হাসিখুশী কি সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন? উনি নিজে ছাড়া বাড়ির আর কেউ কি তাঁরই মত হাসিখুশী ছিলেন?”

কথাটা শোনামাত্র যেন একটা জানলা খুলে গেল পৃথ্বীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে। এ যেন দীর্ঘদিন চোখের সামনে থাকার পর সহসা কোনো জিনিসকে নতুন করে চেনা। অবাক হয়ে গেল পৃথ্বীন্দ্রনাথ। সত্যিই তো! ভৌমিক-ভবনে যাতায়াত তার আজকের নয়, বহুদিনের। কিন্তু আজ মনে হল, এ বাড়ির নাম

আনন্দ-ভবন হওয়া উচিত হয়নি, নিরানন্দ-ভবন হলেই মানাতো ভাল। লম্বা লম্বা বেজায় উঁচু ঘরগুলো কেমন জানি বড্ড ফাঁকা ফাঁকা, নিরাভরণ, টানা করিডরগুলোয় ম্রিয়মাণ বিদ্যুৎবাতির দৌলতে বিষাদ যেন মৌরসীপাট্টা গেড়েছে, গৃহস্বামী ডক্টর ভৌমিক সদাহাসিখুশী বটে, কিন্তু উত্তাপবিহীন। বাড়ির আর সবাইও যেন গৃহস্বামীরই ছায়া। বিশাল-স্কন্ধ উদ্দালক মিত্রের অমায়িক ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব নেই বটে, কিন্তু অভাব আছে হৃদয়ের উত্তাপের। গ্যাস ম্যান্টেলের মত এমন একটা বিষণ্ণতা ভদ্রলোককে সদাই ঘিরে থাকে, যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। আর রিণা ভৌমিক? ঈশ্বর তাকে রূপ দিয়েছেন, রূপো দিয়েছেন, কিন্তু অষ্টাদশীর প্রাণোচ্ছলতা দেননি।

আজ মনে হল পৃথ্বীন্দ্রনাথের—এতদিন যা দেখেছে, তা চর্মচক্ষে দেখেছে, কর্মচক্ষে দেখেনি।

বাস্তবিকই, আনন্দ-ভবনে আনন্দ নেই। কোনোদিনই ছিল না।

অকুস্থলে এসে পৌঁছেছিল ফাদার ঘনশ্যাম আর পৃথ্বীন্দ্রনাথ। অদূরে উদ্দালক মিত্রের সঙ্গে কথা বলেছিলেন রাজশেখর ভট্টাচার্য। রাজশেখরবাবু পৃথ্বীন্দ্রনাথের ইমিডিয়েট 'বস'।

ঘনশ্যাম পাদরীর খর্বকায় মূর্তি দেখেই অস্বাভাবিক আনন্দে হাত তুলে এগিয়ে এলেন উদ্দালক মিত্র। পৃথ্বীন্দ্রনাথ রাজশেখরবাবুর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "স্যার, রহস্যের কিনারা হল?"

"রহস্য-টহস্য কিছু নেই," জবাব দিলেন রাজশেখরবাবু।

"কিন্তু আমার কাছে আছে," হাসিমুখে বলল পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

"আরে না, না, যা ভাবছ তা নয়," গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন রাজশেখরবাবু। "উদ্দালকবাবু তোমাকে ঐ ভদ্রলোককে ডেকে আনতে পাঠানোর তিন মিনিটের মধ্যেই সব রহস্যের

অবসান ঘটেছে। যে চাকরটা ট্রেন থামিয়েছে, তাঁকে তো তুমি চেন, তাই না ?”

“তা আবার চিনি না। বেটা আহম্মকের ধাড়ি হলে কি হবে, মুখখানা তো গরিলার মত—দেখলে ভয় লাগে।”

“এ কাজ সেই বেটারই। ট্রেনও গেল, খুনেও উধাও হল। ট্রেন গেল পুলিশ ডাকতে, খুনে সটকান দিল তাতে। খাসা মাথা বটে !”

“কিন্তু এ কাজ যে তারই, সে বিষয়ে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে ?” জানতে চাইল তরুণ ডিটেকটিভ।

“কোন সন্দেহ নেই আমার। কারণ মনিবের টেবিলের ড্রয়ার থেকে হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল সে যাবার সময়ে নিয়ে গেছে। খুন সে-ই করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, করল কী করে। কেননা মাথাটা এমনভাবে গুঁড়িয়েছে যে বড় আর ভারী অস্ত্র ছাড়া অমন ঘা দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ ধারে-কাছে সে রকম কোনো অস্ত্রের চিহ্নও দেখতে পেলাম না। এমনও হতে পারে যে হত্যাকারী যাবার সময়ে বুদ্ধি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। হয়ত খুবই ছোট্ট অস্ত্র, তাই কারো নজরে পড়েনি।”

“হয়ত খুবই বড় অস্ত্র, তাই কারো নজরে পড়েনি,” খুক-খুক করে হেসে বললে ঘনশ্যাম মণ্ডল।

সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন রাজশেখরবাবু। তারপর কঠিনকণ্ঠে বক্তার কাছে টিপ্পনীর মানে জানতে চাইলেন।

ক্ষমার ভঙ্গীতে কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলল ঘনশ্যাম—“শুনলে রূপকথা মনে হবে। কিন্তু অতিকায় গদার ঘায়ে প্রতাপসিংহের ভৌমিকের মাথা চুর হয়েছে। দানবিক গদা। বিশাল সবুজ গদা। এত বড় যে চোখে ধরা পড়ে না—আমরা যাকে বলি ধরিত্রী। যার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি। সেই সবুজ জমির ওপরেই মাথা ভেঙেছেন প্রতাপসিংহ ভৌমিক।”

"কি বলতে চান আপনি ?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বড় গোয়েন্দা।

চাঁদের মত গোলাকার মুখ তুলে ওপরে তাকালো ফাদার ঘনশ্যাম। ঘাড় কাৎ করে তাকাতে হল অনেক ওপরে। দৃষ্টি অনুসরণ করে বাকী সবাইও ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে পেলে অনেক উঁচুতে খোলা রয়েছে একটা জানলা।

শিশুর মত সরলমুখে আঙুল তুলে জানলাটা দেখিয়ে আমতা আমতা করে বলল ফাদার ঘনশ্যাম—"দেখছেন না, ভদ্রলোককে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে ঐ জানলা দিয়ে ?"

ভ্রূকুটি করে অনেকক্ষণ দেখে রাজশেখরবাবু বললেন—"অসম্ভব। কিন্তু আপনার অনুমানই যে ধ্রুব সত্য তা জানছেন কী করে।"

চোখ বড় বড় করে বলল ফাদার মণ্ডল—"কেন ডেডবডির পায়ে জড়ানো রয়েছে এক টুকরো দড়ি। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন না, দড়ির বাকী টুকরো জানলার কোণে লেগে রয়েছে ?"

এত নিচু থেকে জিনিসটাকে এককণা চুল অথবা ধুলোর মতই অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ গোয়েন্দা রাজশেখরবাবু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন—"ঠিক বলেছেন ফাদার, অকাট্য প্রমাণই বটে।"

মুখের কথা শেষ হতে না হতেই অদূরে এসে দাঁড়াল একটা পুলিশ ট্রাক। টপাটপ গাড়ি থেকে নামল কয়েকজন কনষ্টেবল আর সার্জেণ্ট। মাঝখানে কালো পোশাক পরা ভীমদর্শন খাসভৃত্য পল্টুলাল।

"সাবাস! সাবাস! খুনেব্যাটা ধরা পড়েছে দেখেছি," বলে সোৎসাহে এগোলেন রাজশেখরবাবু।

সামনের কনষ্টেবলকে দেখেই হেঁকে উঠলেন—"টাকা পেয়েছ ?"

ঘাবড়ে গেল কনষ্টেবল। আমতা আমতা করে বললে—“কিসের টাকা স্যার?”

“আপনাদের মধ্যে ইন্সপেক্টর কে?” জানতে চাইল পল্টুলাল।

গলা শুনেই বোঝা গেল কেন এই স্বর শুনে চলন্ত ট্রেনও দাঁড়িয়ে পড়েছে। পল্টুলালের চেহারাটি দিব্বি গাঁট্টা-গোঁট্টা—চোখ মুখ নিরেট বোকার মত হলে কী হবে হাবভাব অত্যন্ত ক্ষিপ্র। বিশেষ করে গরিলার মত ভয়ংকর থ্যাবড়া মুখ আর মিশমিশে কালো জামা প্যাণ্টে দেখতে তাকে অনেকটা কালো জাগুয়ারের মতই। মধ্যপ্রদেশে চম্বল উপত্যকার এক কুখ্যাত অঞ্চল থেকে তাকে উদ্ধার করে এনেছিলেন ডক্টর ভৌমিক। মুখটা তার মৃতের মত ভাষাহীন হলে কী হবে, গমগমে গলার মধ্যে যেন আরব্য-রজনীর দৈত্য কথা কয়ে উঠল। এমন ভরাট, এমন ঝংকারময়, এমন বিস্ময়কর কণ্ঠ বড় একটা শোনা যায় না। যেন যাদু লুকিয়ে ছিল সে স্বরে। ডক্টর ভৌমিক কানে খাটো থাকার ফলে হয়ত এ রকম আকাশ-কাঁপানো গলায় কথা বলতে শিখেছে পল্টুলাল। যাই হোক গলা শুনেই উপস্থিত প্রত্যেকেই যেন চাবুক খাওয়ার মতই সচমকে ফিরে তাকালো।

ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চলল পল্টুলাল—“আমি জানতাম, ওঁর কপালে অপঘাতে মৃত্যু আছে।”

“সার্জেণ্ট,” তীব্র রাগতকণ্ঠে বললেন রাজশেখরবাবু, “হাতকড়া লাগান নি কেন? লোকটাকে সুবিধের মনে হচ্ছে না।”

অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে জবাব দিলে সার্জেণ্ট—“কিন্তু স্যার, কী করা উচিত তাই তো ভেবে পাচ্ছি না।”

“তার মানে?” ঝটিতি জিজ্ঞেস করলেন রাজশেখরবাবু। “আপনি কী বলতে চান? এখনও অ্যারেষ্ট করেননি ওকে?”

ব্যঙ্গের ফিকে হাসি ফুটে উঠল পল্টুলালের ঠোঁটের কোণে। ঠিক এই সময়ে দূর থেকে ভেসে এল ট্রেনের বাঁশি। এগিয়ে আসছে

একটা ট্রেন। পল্টুলালের নিঃশব্দ বিদ্রূপই যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল হুইশ্‌লের মধ্যে।

সার্জেণ্ট বললে—"অ্যারেষ্ট করেছি। কিন্তু তার আগেই ফাঁড়িতে ও-সির কাছে টাকাটা গচ্ছিত রেখে ও বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়।"

হকচকিয়ে গেলেন রাজশেখরবাবু।

বিমূঢ় চোখে পল্টুলালকে শুধু প্রশ্ন করলেন, "কেন?"

"খুনেটার হাত থেকে টাকা নিরাপদে রাখার জন্যে," প্রশান্ত-কণ্ঠে জবাব দিল পল্টুলাল।

"তা তো বটেই," বললেন রাজশেখরবাবু। "ডক্টর ভৌমিকের টাকা ডক্টর ভৌমিকের ফ্যামিলিতেই নিরাপদে থাকা উচিত।"

শেষের কথাগুলো ডুবে গেল ছুটন্ত ট্রেনের চাকার নির্ঘোষে। মাঠ বাড়ি কাঁপিয়ে ঝনঝন শব্দে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো বটে, কিন্তু সে শব্দকেও ছাপিয়ে শোনা গেল পল্টুলালের ঘণ্টাধ্বনির মতই স্পষ্ট আশ্চর্য কণ্ঠ—"ডক্টর ভৌমিকের ফ্যামিলিকে আমি বিশ্বাস করি না।"

দূর হতে দূর মিলিয়ে গেল ট্রেনের হুহুংকার। ধীরে ধীরে নেমে এল সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে গেছিল সকলে। খর্বকায় পাদরীর কাঁধের ওপর দিয়ে প্রতাপসিংহ-তনয়ার ফ্যাকাশে মুখ দেখে মোটেই বিস্মিত হল না পৃথ্বীন্দ্রনাথ। স্যাম্পু করা চুলের মতই বিশুষ্ক সে মুখ।

থমথমে গলায় বললেন উদ্দালক মিত্র—"ওজন করে কথা বলতে দেখছি এখনো শেখনি। যার নুন খাওয়া, তারই—"

"নুন যাঁর খেয়েছি, তিনি আর নেই। তাঁর মেয়েকে আমি চিনি। কাজেই সত্যিকথা বলতে ডরাই না," স্পষ্টকণ্ঠে বলল পল্টুলাল।

বেদনায় যেন নীল হয়ে উঠল রিণা ভৌমিকের রক্তহীনমুখ।

থর থর করে কাঁপতে লাগল গোলাপের পাপড়ির মত অধরোষ্ঠ।

পল্টুলাল আবার বললে—"দিদিমণির এরকম কাঁপুনি অনেক দেখেছি। একদিন দুদিন নয়, বছরের পর বছর। কেউ বলেছে ঠাণ্ডার কাঁপুনি, কেউ বলেছে ভয়ের। কিন্তু আমি জানি এ কাঁপুনি ঘৃণার আর প্রচণ্ড রাগের—আজ ভোরেই যা চিরকালের মত শেষ হয়ে গেল। আমি না থাকলে মনের মানুষকে নিয়ে টাকার বাণ্ডিল সমেত এতক্ষণে কোথায় বার হয়ে যেতেন দিদিমণি। লম্পট পাজীটাকে যেদিন থেকে বিয়ে করার জন্যে গোঁ ধরেছেন উনি, সেদিন থেকেই বেঁকে বসেছেন কর্তাবাবু—"

"চোপরাও" কড়া গলায় ধমকে উঠলেন উদ্দালক মিত্র। "পারিবারিক কেলেঙ্কারী শোনাবার আর জায়গা পাওনি। স্কাউণ্ড্রেল! প্রমাণের নাম গন্ধ নেই, বেয়াদবির চূড়ান্ত!"

"প্রমাণ ? তাও আছে" বেপরোয়া সুরে বলল পল্টুলাল। "শুনুন, আপনারা সবাই শুনুন। কর্তাবাবুকে জানলা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়ার পরেই ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম রক্তাক্ত ছোরা হাতে মেঝের ওপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছেন দিদিমণি। "এই নিন সেই ছোরা," বলে পকেট থেকে মোষের শিংয়ের হাতলওলা একটা ছুরি বার করে সার্জেন্টের হাতে তুলে দিল পল্টুলাল। তখনও কাঁচা রক্ত লেগে রয়েছে ছুরির ফলায়।

ফিসফিস করে রাজশেখরবাবু কানে কানে বললে পৃথ্বীন্দ্রনাথ—"স্যার, পল্টুলালের বিরুদ্ধে মিস ভৌমিকের কিছু বলার আছে কিনা জানা দরকার।"

হঠাৎ মুখ তুলল ফাদার ঘনশ্যাম। সতেজ মুখ। যেন এইমাত্র ধুয়ে এলেন, এমনি উজ্জ্বল। নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু পল্টুলালের বিরুদ্ধে মিস ভৌমিকের কিছু বলার আছে কি ?"

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকার করে উঠল রিণা ভৌমিক। চমকে সকলে ফিরে তাকালে তার দিকে। পক্ষঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট দেহে দাঁড়িয়েছিল তরুণী রিণা। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে নিবিড় বিস্ময়।

গুরুগম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন রাজশেখরবাবু—“হত্যার পরেই পল্টুলাল আপনাকে ছুরি হাতে দেখেছে—কথাটা সত্যি ?”

“সত্যি,” জবাব দিল রিণা।

এর পরেই যা ঘটল, তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউই। আচম্বিতে চলন্ত পাহাড়ের মত ছুটে এলেন উদ্দালক মিত্র। কেউ কিছু বোঝবার আগেই দারুণ এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন পল্টুলালের গরিলামুখে। এক ঘুসিই যথেষ্ট। গাঁক করে উঠে জেলী মাছের মত হাত পা ছড়িয়ে ধড়াশ করে আছড়ে পড়ল পল্টুলাল।

তৎক্ষণাৎ তিনজন কনষ্টেবল হাত চেপে ধরল উদ্দালক মিত্রের। বজ্রকঠিন গলায় বললেন রাজশেখরবাবু—“যথেষ্ট হয়েছে। মারপিট করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো আমি।”

“না,” সেন্ট পল্‌স গির্জের ঘণ্টাধ্বনির মত গমগমে গলায় জবাব দিলেন উদ্দালক মিত্র। “হত্যার অপরাধে আমাকে গেপ্তার করতে হবে আপনাকে।”

ভূলুণ্ঠিত পল্টুলাল তখন উঠে বসেছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছচে গালের রক্ত—যদিও মুখে ক্ষতের কোন চিহ্ন নেই।

“কী বলতে চান আপনি ?” জানতে চাইলেন রাজশেখরবাবু।

উদ্দালক মিত্র বললেন—“পল্টুলাল ঠিকই বলেছে, রক্তমাখা ছুরিটা মিস রিণা ভৌমিকেরই হাতে ছিল। কিন্তু সে ছুরি নিয়ে বাবাকে খুন করতে যায়নি রিণা—গেছিল তাঁকে বাঁচাতে।”

“বাঁচাতে ? কার হাত থেকে ?”

“আমার হাত থেকে।”

অদ্ভুত চোখে উদ্দালক মিত্রের দিকে তাকিয়েছিল রিণা ভৌমিক। জটিল ধাঁধার জট ছাড়াতে না পারবে এমনি বিমূঢ়দৃষ্টিই

ফুটে ওঠে মানুষের চোখে। অত্যন্ত মৃদু স্বরে সে বললে—“যাক, সাহসটুকু এখনও হারাওনি দেখে খুশী হলাম।”

“ওপরে আসুন। সব দেখাচ্ছি,” ভারী গলায় বললেন উদ্দালক মিত্র।

ঘরটা উদ্দালক মিত্রেরই। খুবই ছোট্ট। ভয়ানক নাটকের সব কিছুই উপস্থিত সেখানে। ঘরের মাঝে পড়ে একটা মস্ত রিভলভার—কে যেন ছুড়ে ফেলে দিয়েছে সেখানে। বাঁদিকে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা হুইস্কির বোতল—অর্ধেক শূন্য। ছিপি খোলা। টেবিলের কাপড় লণ্ডভণ্ড—যেন সেখানেও টানাটানি চলেছে। মৃতের পায়ে যে রকম দড়ি দেখা গেছে, সেই রকম দড়ি খানিকটা এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে জানলার চৌকাঠে। দেওয়ালের গায়ে আছড়ে ভাঙা হয়েছে দুটো ফুলদানী—তৃতীয়টা কার্পেটের ওপর।

উদ্দালক মিত্র বললেন—“যা কিছু করেছি মদের নেশায় করেছি।” শিশুর মত সরল সেই স্বীকারোক্তি শুনে কারো মুখে কোনো কথাই ফুটল না।

“আপনারা জানেন জীবনে কত ঘা খেয়েছি আমি” বলে চললেন উদ্দালক মিত্র। “সকলেই জানে। শেষকালে মদের আড্ডা থেকে আমাকে উদ্ধার করে আনেন ডক্টর ভৌমিক। সর্বনাশের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন উনি—কিন্তু মেয়েকে বিয়ে করতে চাই শুনেই খেপে গেলেন। যাক, বেশী কথায় কাজ নেই। ঐ কোণে অর্ধেকশেষ হুইস্কির বোতলটা আমারই, কার্পেটের ওপর গুলিশূন্য রিভলভারটাও আমার। লাশের পায়ে যে দড়ি দেখেছেন, জানলায় যে দড়ি দেখছেন তা আমারই আলমারী থেকে বেরিয়েছে। ডক্টর ভৌমিককে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে যে জানলা থেকে, সেটাও আমারই ঘরের জানলা। অযথা আর মাথা ঘামাবেন না। স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছি।”

এরপরে হত্যাকারী সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কাজেই সার্জেন্ট দুজন কনষ্টেবল নিয়ে এগিয়ে এল উদ্দালক মিত্রকে থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

কিন্তু তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করার আগেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য ঘটতে দেখা গেল।

আচম্বিতে দরজার কাছে কার্পেটের ওপর হামাগুড়ি দিতে শুরু করল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল। পরক্ষণেই স্থূলকায় চতুষ্পদ জন্তুর মতই মুখ ফেরালো সঙ্গীদের দিকে। গোলগাল হাস্যকর নির্বোধ সেই মুখের উল্লাস দেখে হতভম্ব হয়ে গেল ঘরের সকলে।

ঘনশ্যাম বলল—"উঁহু, চলবে না, ওতে ভবি ভুলবে না। প্রথমে শুনলাম, কোনো অস্ত্রই পাওয়া যায়নি। এখন দেখাচ্ছেন এক গাদা অস্ত্র। খুঁচিয়ে মারার জন্যে ছুরি, ফাঁসি দেওয়ার জন্যে দড়ি, গুলি করার জন্যে পিস্তল; শেষকালে কিনা জানলা গলে নিচে পড়ে মাথা ভেঙ্গে মারা গেলেন ডক্টর ভৌমিক! উঁহু, এতে হবে না! খরচেই পোষায় না এ খুনে!" বলে, আবার মুখ নামিয়ে চারপেয়ে জানোয়ারের ঘাস খাওয়ার মতই দ্রুত হামাগুড়ি দিতে লাগল চার হাত-পা টেনে।

চকিতে সিরিয়াস হয়ে গেলেন রাজশেখরবাবু। তেরিয়া মেজাজে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই প্রফুল্লকণ্ঠে কথা বলে উঠল চতুষ্পদ কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি।

"তিনটে অসম্ভব জিনিস দেখতে পাচ্ছি। প্রথম—কার্পেটের এই ফটোগুলো; ছটা কার্টিজ ছোঁড়া হয়েছে এই দিকেই। কার্পেট লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে কাউকে দেখেছেন? মাতাল যদি খুন করতে চায় তো শত্রুর মাথা লক্ষ্য করেই ট্রিগার টেপে, তার পা অথবা চটির সঙ্গে কোনো ঝগড়া থাকে না। তারপর ধরা যাক এই দড়িটা", বলে কার্পেট পর্যবেক্ষণ শেষ করে দু-হাত তুলে পকেটে পুরল ফাদার ঘনশ্যাম। কিন্তু অব্যাহত রইল হাঁটু দিয়ে

হাঁটা—"এমন কোনো নেশার নাম শুনেছেন, যার প্রভাবে মানুষের গলায় ফাঁস পরিয়ে খুলে নিয়ে পায়ে পরাতে হয় ? উদ্দালক মিত্র সেরকম মাতাল এখনও হননি, হলে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না, এতক্ষণে নাক ডাকাতেন। সবচাইতে চোখে আঙ্গুল দেওয়া জিনিস হল হুইস্কির বোতলটা। এইমাত্র যা শুনলাম, তার সাদা মানে দাঁড়ায় এই যে উৎকট সুরাপিপাসায় ছটফট করতে করতে একজন মাতাল বোতলটা অর্ধেকখানি খালি করে গড়িয়ে দিয়েছে কার্পেটের ওপর। মদের নেশা যাদের এত প্রচণ্ড হয়, এমন আহাম্মুকি তারা কখ্‌খনো করে না।"

বলে, হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে দাঁড়াল ফাদার ঘনশ্যাম।

পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললে উদ্দালক মিত্রকে—"মশায়, আমি ভীষণ দুঃখিত। কিন্তু আপনার গল্পটা একেবারেই রাবিশ।"

"ফাদার", ফিস-ফিস করে বললে রিণা ভৌমিক। "আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি ?"

পাশের ঘরে এসে ফাদার ঘনশ্যাম মুখখোলার আগেই আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে রিণা ভৌমিক—"আমি জানি, উদ্দালককে আপনি বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।"

"কেন ?" পলকহীন চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল ঘনশ্যাম পাদরী।

"কেননা আমি নিজের চোখে বাবাকে খুন করতে দেখেছি ওকে," সমান তেজে জবাব দিল রিণা।

"বটে !" বলল অবিচলিত ঘনশ্যাম। "কিভাবে খুন করলেন ?"

"আমি পাশের ঘরে ছিলাম। দুঘরের দরজাই বন্ধ ছিল। হঠাৎ শুনলাম কে যেন বিকট বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'নরক নরক, নরক !' তারপরেই বাড়ী কেঁপে উঠল পর-পর তিনবার গুলি ছোঁড়ার আওয়াজে। পড়ি কি মরি করে দৌড়ে এসে দরজা খুলেই শেষ গুলিটা ছুঁড়তে দেখলাম উদ্দালককে। ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি

হয়েছিল। তারই মধ্যে দেখতে পেলাম জানলার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে দারুণ ভয়ে কাঁপছে বাবা। রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে দড়ি তুলে নিয়ে ফাঁসটা বাবার গলায় পরিয়ে দিল উদ্দালক। কিন্তু ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে নেমে এসে আটকে গেল পায়ে। সেই অবস্থায় উন্মাদের মত বাবাকে হিড়-হিড় করে টানতে লাগল উদ্দালক। আমি যেন কিরকম হয়ে গেলাম। সামনেই কার্পেটের ওপর একটা ছুরি পড়েছিল। ছুরিটা তুলে নিয়ে এক দৌড়ে দুজনের মাঝে পড়ে দড়িটা কাটতে লাগলাম। দড়ি কাটল, আমিও জ্ঞান হারালাম।”

“বটে,” ভাবলেশহীন মুখে বলল, ফাদার ঘনশ্যাম। “ধন্যবাদ।”

উত্তেজনায় আর একবার মূর্ছা গেল রিণা ভৌমিক। আর, কাঠের পুতুলের মত শক্ত দেহে নির্বিকারভাবে পাশের ঘরে ফিরে এল ফাদার ঘনশ্যাম।

সে ঘরে তখন তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। সোফায় বসে রাজশেখরবাবু, পৃথ্বীন্দ্রনাথ আর হাতকড়িবদ্ধ উদ্দালক মিত্র।

পৃথ্বীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে খুব শান্তগলায় বললে ঘনশ্যাম —“আপনাদের সামনেই কয়েদীকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি? তার আগে ওঁর হাতকড়িটা খুলে দেওয়ার অনুরোধ করব।”

নিচু গলায় বললে পৃথ্বীন্দ্রনাথ—“ভদ্রলোকের গায়ে অসুরের মত শক্তি—সে খেয়াল আছে? কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন?”

বিনীতকণ্ঠে বলল ঘনশ্যাম—“কারণ ঐ হাতদুটো আমি জড়িয়ে ধরে ধন্য হতে চাই।”

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। ফাদার ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করল উদ্দালক মিত্রকে—“আপনি কি এখনও সত্যি বলবেন না?”

গোঁয়ারের মত মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল উদ্দালক মিত্র

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ঘনশ্যাম—“বেশ, তাহলে আমিই বলছি। সামাজিক যশের চাইতে মানুষের জীবন অনেক দামী। যিনি গেছেন, তিনি আর ফিরবেন না। কিন্তু যিনি রয়েছেন, তিনি আমাদের মধ্যেই থাকুন।”

জানলার সামনে গিয়ে বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে বললে খর্বকায় পাদরী—“একটু আগে বলছিলাম, অনেক বেশী অস্ত্র জুটেছে এ কেসে। মৃত্যু কিন্তু একটা। এখন বলছি, অস্ত্র যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো অস্ত্রই নয়। কারণ মৃত্যু ঘটানোর জন্যে তাদের কাজে লাগানো হয়নি। যে ক'টা ভয়ানক হাতিয়ার আপনারা দেখেছেন, দড়ির ফাঁস, রক্তমাখা ছুরি, পিলে চমকানো রিভলবার—তারা মৃত্যুর দূত নয়, মহত্ত্বের প্রতীক। ডক্টর ভৌমিককে হত্যা করার জন্য তাদের ব্যবহার করা হয়নি, হয়েছে তাঁকে বাঁচানোর জন্যে।”

“বাঁচানোর জন্যে!” পুনরাবৃত্তি করলেন রাজশেখরবাবু। “কার কাছ থেকে?”

“নিজের কাছ থেকে। ডক্টর ভৌমিক মানসিক রোগে ভুগছিলেন। আত্মহত্যাপ্রবণতা আধুনিক সমাজের অভিশাপ।”

“কী বলছেন? সমাজের মুখে হাসি ফোটাতেই যিনি জীবন ব্যয় করলেন—”

“কমেডীয়ানের ট্র্যাজেডী তো সেইখানেই। তিনি ছিলেন তাদেরও উর্ধ্বে। সমাজকল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, তিল তিল করে গ্লানি জমতে থাকে অন্তরে। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে তিক্ততার জ্বালা। শেষে শরণ নিলেন সুরার। মদ মানুষের মনে আগুন সাময়িকভাবে নেভায় বটে, কিন্তু বিনিময়ে দেয় অপরিসীম শূন্যতা, মরুভূমির মত যা উষর। আজ সকালেই তাঁর এই নিঃসঙ্গ যাতনা চরমে পৌঁছায়। সহ্য করতে না পেরে অব্যক্ত

বেদনাকেই কোনারকমে ফুটিয়ে তোলেন ভাঙা গলায়; 'নরক-নরক-নরক'—এই চীৎকার শুনে রিণা ভৌমিক চিনতে পারেননি—কেন না বাবাকে এভাবে কথা বলতে তিনি কোনদিন শোনেননি।

"যাই হোক, মৃত্যুপাগল ডক্টর ভৌমিক একাধিক অস্ত্রের সমাবেশ করেছিলেন নিজের চারপাশে। দড়ির ফাঁস, ছুরি আর সেক্রেটারীর রিভলভার। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢোকেন উদ্দালক মিত্র। নিমেষের মধ্যে তিনি বুঝতে পারেন কি ঘটতে যাচ্ছে। আর সময় ছিল না। কাজেই বিদ্যুৎগতিতে প্রথমেই ছুরীটা টান মেরে ফেলে দিলেন কার্পেটের ওপর। রিভলভারটা ছিনিয়ে নিলেন, কার্তুজ খুলে রাখার সময় ছিল না বলে কার্পেট লক্ষ্য করে উপর্যুপরি ট্রিগার টিপে খালি করে ফেললেন ছটা ঘর। আত্মহত্যা-পাগল প্রতাপসিংহ ভৌমিকের সামনে দেখা দিল মৃত্যুর আর একটি পথ। খোলা জানলার দিকে বেগে ছুটে গেলেন তিনি। এক্ষেত্রে তাঁকে বাঁচানোর শুধু একটি উপায়ই ছিল। উদ্দালক মিত্র চোখের পলক ফেলার আগে তা করলেন। অর্থাৎ দড়ির ফাঁস দিয়ে তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেলার চেষ্টা করলেন। ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন মিস ভৌমিক। ঝটাপটির একটা কুৎসিত অর্থ ভেবে নিয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে এলেন বাবাকে বাঁচাতে। ছুরিটা কার্পেটের ওপর থেকে তুলে নিয়ে দড়ি কাটতে গেলেন। প্রথম কোপেই হাত ফসকে কব্জি কেটে গেল উদ্দালক মিত্রের। সেই কারণেই পল্টুলালকে উনি ঘুসি মারার পর তার মুখে ক্ষত দেখতে পাননি, কিন্তু রক্ত দেখেছেন।

"যাই হোক দড়িটা কোনমতে দুটুকরো করে আর সামলাতে পারলেন না মিস ভৌমিক। মূর্ছা গেলেন। আর ঠিক তক্ষুনি বন্ধনমুক্ত হয়ে ছিটকে জানলা দিয়ে নিচে আছড়ে পড়লেন ডক্টর প্রতাপসিংহ ভৌমিক।"

অনেকক্ষণ কোনো শব্দ শোনা গেল না ঘরের মধ্যে। বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল ঘনশ্যাম মণ্ডল।

অবশেষে লোহায় লোহায় ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ শোনা গেল পেছনে। মুখ ফেরাল ঘনশ্যাম। উদ্দালক মিত্রের হাতকড়ি খুলে দিচ্ছেন রাজশেখর ভট্টাচার্য।

মৃদুকণ্ঠে বলছিলেন রাজশেখরবাবু—"সত্যি কথাটা বলা উচিত ছিল আপনার। ডক্টর ভৌমিকের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা গোপন করার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু তার চাইতে আপনার আর তাঁর মেয়ের জীবনের দাম কি বেশী নয়?"

"গোল্লায় যাক ডক্টর ভৌমিকের জীবনের ব্যর্থতা," কর্কশগলায় হঠাৎ ফেটে পড়লেন উদ্দালক মিত্র। "বুঝলেন না কেন আমার মিথ্যে বলার প্রধান কারণই হ'লো রিণা যেন কিছু জানতে না পারে।"

"কী জানতে না পারে?" জিজ্ঞেস করল পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

"যে রিণাই বাঁচাতে গিয়ে মেরে ফেলেছে নিজের বাবাকে," মেঘের মত গর্জে উঠলেন উদ্দালক মিত্র। "রিণা বাধা দিয়ে না ফেললে উনি এখনও বেঁচে থাকতেন। কিন্তু তা জানলে পাগল হয়ে যাবে রিণা।"

"না, পাগল হবে না" ভাঙা ছাতাটা দরজার কোণ থেকে তুলে নিয়ে বলল ঘনশ্যাম মণ্ডল। "আমিই বরং খুলে বলছি তাকে। অনেক জিনিস আছে, উদ্দালকবাবু, যা গোপন করার বিষময় পরিণতি সারা জীবন ধরে বইতে হয়। কিন্তু আমি চাই আপনারা দুজনে সুখী হন। আমার আশীর্বাদ রইল।"

বলে, পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল বামন পাদরী ঘনশ্যাম মণ্ডল।

আমি থামতেই উঠে দাঁড়াল ফাদার ঘনশ্যাম। বলল—"কাল

আমাকে নর্থ কানাড়া যেতে হচ্ছে। হপ্তাদুয়েকের আগেতো ফিরতে পারব না।”

“আপনি না থাকলে গল্পও জমবে না,” বললেন অম্বুবৌদি। “তার চাইতে বরং আসর এখুন মুলতুবী থাকুক।”

“তাই থাকুক, আর আমিও বাঁচি,” তৎক্ষণাৎ বলল ইন্দ্রনাথ।

“আমিও,” সায় দিলাম আমি।

3338

“তোমার বাঁচা আমি বার করছি,” চোখ পাকিয়েবলল কবিতা।

এর পরের দাম্পত্যকলহের বর্ণনা আর নাই বা দিলাম।

MANIK BANDYOPADHYAYA SMRITI PATHAGAR
P.O. GHOGOMALI
DIST. JALPAIGURI
ESTD. - 1978
boighar.net